দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

শোভন সোম
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : দীপঙ্কর ধর।
রাজেন্দ্র অফসেট। ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯।





কবি ও পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২ ১৯৩৫) বিচিত্রমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী হলেও তাঁর self-abnegation বা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার ক্ষমতাও ছিল তুলনাহীন। বর্তমানে তাঁকে কবি, অভিনেতা, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক হিসেবে স্মরণ করা হয় না, কেবল রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে তাঁর কথা আলোচিত হয়।

শেক্সপীয়র গান লিখতেন, যা যে কেউ যে-কোন সুরে গাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গান লিখতেন, গানে সুর দিতেন এবং এই সুরের স্বত্ব অক্ষয় করে রাখার মানসে গানগুলির স্বরলিপি লিখিয়ে প্রকাশ করতেন। অসামান্য সুরজ্ঞান সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ স্বরলিপি লেখায় পারঙ্গম ছিলেন না। তাঁর হস্তাক্ষরে একটি মাত্র স্বরলিপি পাওয়া যায় বলে প্রচারিত। স্বরলিপি লেখায় এই অপটুত্বের জন্যে গান লিখে সুর দিয়ে অপর কাউকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেরি না করে সেটির স্বরলিপি তোলাতে তৎপর হতেন, কারণ, তাঁর ছিল অসামান্য বিস্মরণশক্তি। স্বরলিপি লেখায় নিজের পটুত্বের অভাবের কথা এবং নিজের বিস্মরণক্ষমতার কথা তিনি স্বয়ং বারবার উল্লেখ করে গিয়েছেন। এ কারণে, স্বরলিপি লিখতে পারঙ্গম এমন কাউকে তাঁর কাছাকাছি দরকার হত। তাঁর গানের স্বরলিপি অনেকে লিখেছেন, কিন্তু তিন-তিনটি দশক তাঁর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে থেকে তাঁর গানের সাতশো-র বেশি স্বরলিপি লিখে যিনি বাকি সকল স্বরলিপিকারকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে রেখে গিয়েছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথেরই একুশ বছরের বড়ো দাদার নাতি দিনেন্দ্রনাথ। দিনেন্দ্রনাথ কবিতা লিখতেন, গান লিখতেন, সুর দিতেন, অভিনয় করতেন, সাহিত্যরস সম্ভোগে তাঁর ছিল খ্যাতি, বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে তিনি অনুবাদ করতেন, তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ লিখতেন এবং মজলিশধারী হিসেবে তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর প্রপিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দেওয়া দীনেন্দ্রনাথ নামটিই রবীন্দ্রনাথ পালটে নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করে দিনেন্দ্রনাথ করে দিয়েছিলেন। নামের এই দ্বিজত্বের অভিভাবনে আবেশগ্রস্ত দিনেন্দ্রনাথ নিজের সৃজনীক্ষমতাকে সম্পূর্ণ গৌণ করে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সংরক্ষণে ও প্রচারে আপনাকে একলব্যের মতো নিবেদন করেছিলেন। এমন আত্মনিবেদন একালে তুলনাহীন।

দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শান্তিনিকেতন মন্দিরে আয়োজিত স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে "কর্মের মধ্যে যে-একটি আনন্দের ভিত্তি আছে...আনন্দের সেই আয়োজনে দিনেন্দ্র আমার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম, তখন চারদিকে ছিল নীরস মরুভূমি...তখন চারদিকে এমন

শ্যামশোভার বিকাশ ছিল না। এই আশ্রমকে আনন্দনিকেতন করবার জন্যে তরুলতার শ্যামশোভা যেমন, তেমনি প্রয়োজন ছিল সংগীতের উৎসবের। সেই আনন্দ উপচার সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্র। এই আনন্দের ভার যে ব্যাপ্ত হয়েছে, আশ্রমের মধ্যে সজীবভাবে প্রবেশ করেছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, এর মূলেতে ছিলেন দিনেন্দ্র।...আমার কবি-প্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি, সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্দ্র। অনেকে এখান থেকে গেছেন, সেবাও করেছেন; কিন্তু তার রূপ নেই বলে ক্রমশ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের রূপ, এতো যাবার নয়—যতদিন ছাত্রদের সংগীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন চলবে, ততদিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হতে পারবে না, ততদিন তিনি আশ্রমকে অধিগত করে থাকবেন; আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভোলবার নয়। এখানকার সমস্ত উৎসবের ভার নিয়েছিলেন দিনেন্দ্র, অক্লান্ত ছিল তাঁর উৎসাহ। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে কেউ নিরাশ হয়নি—গান শিখতে অক্ষম হলেও তিনি ঔদার্য দেখিয়েছেন—এই ঔদার্য না থাকলে এখানকার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হত না।"

দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী কমলা দেবী 'দিনেন্দ্র-রচনাবলি' প্রকাশ করেন। সেই রচনাবলির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমার গান শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন তার নিজের গান শুনিনি। ... আমার বিশ্বাস গান সৃষ্টি করা এবং সেটা প্রচার সম্বন্ধে তার কুণ্ঠার কারণ ছিল..পাছে তার যোগ্যতা, তার আদর্শ পর্যন্ত না পৌঁছোয়...এই ছিল তার আশঙ্কা।...কাব্যরসে তার মতো দরদি অল্পই দেখা গেছে।...কবিতা আবৃত্তি করার নৈপুণ্যও ছিল তার স্বাভাবিক।...অথচ কবিতা সে যে নিজে লেখে, এ কথা প্রায় গোপন ছিল বললেই হয়। অনেকদিন পূর্বে কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা সে বই আকারে ছাপিয়েছিল। ছাপা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু পাঠকসমাজে সেটা প্রচার করবার জন্যে সে লেশমাত্র উদ্যোগ করেনি। আমার মনে হয় কোনও একজনের উদ্দেশ্য তার রচনা নিবেদন করাতেই পেয়েছে সে তৃপ্তি, পাঠক-সাধারণের স্বীকৃতির দিকে সে লক্ষ্যই করেনি। চিরজীবন অন্যকেই সে প্রকাশ করেছে, নিজেকে করেনি। তার চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হত। কেন না, নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিস্মরণশক্তি অসাধারণ। আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য, এমনকি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনোদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখিনি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল। আজ স্পষ্টই অনুভব করছি, তার স্বকীয় রচনা চর্চার বাধাই ছিলেম আমি। কিন্তু তাতে তার আনন্দ যে ক্ষুন্ন হয়নি, সে কথা তার অক্লান্ত অধ্যাবসায় থেকেই বোঝা যায়।...দিনেন্দ্রের যে পরিচয় আচ্ছন্ন ছিল, ...আমাদের কাছে সেইটিরই প্রতিষ্ঠা হল তার ওই স্বল্প সঞ্চিত গানে ও কবিতায়। তার নিজের ইচ্ছায় এতকাল এর অদিকাংশই সে প্রকাশ করেনি...।"

রবীন্দ্রনাথ কোনও অত্যুক্তি করেননি। দিনেন্দ্রনাথ যথার্থই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে নিয়ে আপনার আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি কর্তব্যের টানে

তাঁর নিজের সৃষ্টির ক্ষমতাকে তিনি উপেক্ষাই করেছিলেন। 'রবীন্দ্র-সংগীত' অভিধাটিও যে তাঁরই সৃষ্টি, রবীন্দ্রসংগীতের তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাতও যে তিনিই করেছিলেন, সেটিও এক ঐতিহাসিক ঘটনা। দিনেন্দ্রনাথের রচনাবলি এখন দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য। এই কথা মনে রেখে সংগীত বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ দুটি এবং তাঁর নিজের লেখা যে কয়টি গানের স্বরলিপি তিনি রেখে গিয়েছিলেন, সেগুলিও এই সংকলনের সম্পুটে পাঠকের কাছে তুলে ধরা হল।

নবযুবক দিনেন্দ্রনাথের প্রথম পত্নী বীণাপাণি একেবারে বালিকা বয়সে লোকান্তরিত হন। বীণাপাণির মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই অভিভাবকেরা তাঁকে আবার বিয়ে দেন। দ্বিতীয় পত্নী কমলার প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে এই দম্পতিকে সকলে আদর্শ দম্পতি বলে জানতেন। কিন্তু প্রথম পত্নীর মৃত্যুশোক দিনেন্দ্রনাথ ভুলতে পারেননি। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থের 'বীণ' নামের মধ্যে, সেই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'নীরব বীণা'য় সেই স্মরণেরই পরিচয় রয়েছে। শান্তিনিকেতনে বসে তিনি উনিশশো বারো নাগাদ তাঁর কবিতাগুলি ছেপেছিলেন। এর কয়েকটি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কাব্যগ্রন্থের কয়েক কপি বিতরণের পর তিনি বাকি সব কপি সম্ভবত স্বভাবসিদ্ধ কুণ্ঠায় পুড়িয়ে ফেলেন। আত্মপ্রচারে তাঁর কুণ্ঠার কথা তাঁর ছাত্রছাত্রী ও বন্ধুবান্ধবেরা যেমন জানিয়েছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও জানিয়েছেন। তাঁর 'নীরব বীণা', 'বন্ধন', 'হৃদয়-তীর্থ', 'জ্যোৎস্না রাত্রি', 'প্রতীক্ষা', 'মিলন', 'দুইটি হৃদয়', 'সুরের মিল', 'সপ্রকাশ', 'প্রেমের ভাষা', 'মানসী', 'সম্মিলন' ইত্যাদি কবিতায় এক বিরহকাতর হৃদয়ের কথা শোনা যায়। বোঝা যায়, এমন বিশেষ একজনকে শোনাবার জন্যেই এই কবিতাগুলি তিনি লিখেছিলেন যিনি মর্ত্যকায়া অতিক্রম করে শোনার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। ছাপার অক্ষরে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্যে কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হলেও পরে স্বভাবসিদ্ধ কুণ্ঠায় নিজের গোপন কথা আর তিনি প্রচারযোগ্য মনে করেননি বলেই বাকি বই অগ্নিতে অর্পণ করেছিলেন। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই কবিতা একান্তই একজনের অন্তরের বেদনা অকপটে বহন করছে। কবি দিনেন্দ্রনাথ তত্ত্বকথা বলেননি, উপদেশনাও দেননি, এমনকি ব্রহ্মসংগীতও লেখেননি।

কেউ কেউ জানিয়েছেন যে, 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'নীরব বীণা' কবিতাটির বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল বলেই তিনি 'বীণ' বই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক ছিল না, কারণ 'বীণ' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তেরোশো সতেরোর চৈত্র সংখ্যা 'দেবালয়ে', উনিশশো এগারোর মার্চে দিনেন্দ্রনাথের 'সুরের মিল' ও সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যন্ত্রী' কবিতাদুটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় বাংলা মাসিকে অন্যান্য মাসিকে প্রকাশিত গল্প-কবিতা-প্রবন্ধের সমালোচনা হত। রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' পত্রিকা-ও এর ব্যতিক্রম ছিল না। উনিশ শতকের শেষের ও বিশ শতকের গোড়ায় বাংলা পত্র-পত্রিকায় এভাবে বিস্তর কাদা-ছোঁড়াছুড়ি হত। তেরোশো আঠারোর বৈশাখ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন যে, চৈত্র সংখ্যা 'দেবালয়' পত্রিকায় "প্রথমেই শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যন্ত্রী' নামে

একটি চতুর্দশপদী পয়ার...রচনার প্রসাদগুণ আছে, কিন্তু ভাবটি অত্যন্ত পুরাতন। 'হৃদয়বীণা' বাংলায় বহুদিন ধরিয়া বাজিতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'তোমারই বীণা হৃদয়কুঞ্জে বাজে গো যেন বাজে গো' এই প্রার্থনা সফল করিয়া মানসী বাংলাদেশকে জব্দ করিয়া দিয়াছেন। এখন সকল কবিই বীণ-কার। এই দেবালয়ের ক্ষুদ্র চত্বরেই দুই জন—খুড়া সুধীন্দ্রনাথ ও ভাইপো দীনেন্দ্রনাথ—বীণা ধরিয়াছেন। দীনেন্দ্রনাথের 'সুরের মিলে' বীণার সঙ্গে আবার 'বিশ্ব-হৃদয়স্পন্দনে'র তালে তালে 'অম্বরে মৃদঙ্গ' বাজিতেছে। দীনেন্দ্রের বীণা 'নীরব পরশে' বাজিয়া উঠে। পরশ তাহা হইলে দ্বিবিধ,—নীরব ও সরব। হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া দেখিলাম। সে যাহা হউক, বাঙ্গালার কবি সম্প্রদায় যদি গড়ের মাঠে সমবেত হইয়া হৃদয়-বীণা বাজাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সমগ্র ভারতের সমস্ত গোরা-বাজনার ধ্বনি ঢাকিয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। আর, বাঙ্গালার হৃদয়-বীণার তার কি কঠিন। এত টানাটানি, তবু সে পাকা তার এখনও ছিঁড়িল না।" ওই সময়, এবং উনিশশো ষোলো-তে রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' প্রকাশের আগে দিনেন্দ্রনাথ পিতামহ-প্রদত্ত 'দীনেন্দ্রনাথ' বানানই লিখতেন। তাঁর রচনাদি ওই বানানেই ছাপা হত। সুরেশচন্দ্র কোনও উপলক্ষ পেলেই রবীন্দ্র-বিদূষণে তৎপর হতেন। খুড়ো সুধীন্দ্রনাথ ও ভাইপো দিনেন্দ্রনাথ তাঁর উপলক্ষ ছিলেন মাত্র, লক্ষ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সমালোচনার পরে দিনেন্দ্রনাথের 'বীণ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ও তাতে 'দেবালয়ে' প্রকাশিত 'সুরের মিল' কবিতাটিও সংকলিত হয়।

ঠাকুরবাড়ির বালকদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথকে সাহিত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত প্রেরণা জোগাতেন। সেইদিক থেকে দিনেন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর সাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথ কোনও উৎসাহ দিয়েছিলেন, এমন জানা যায় না। বরং জীবনময় রায় একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ তথ্য জানিয়েছেন। জীবনময় ছিলেন দিনেন্দ্রনাথের অনুরাগী ও সুহৃদ এবং একজন একনিষ্ঠ রবীন্দ্রভক্ত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই জীবনময় জানিয়েছিলেন যে, দিনেন্দ্রনাথের "গানের কোনো-কোনোটির অধিকাংশ পরিবর্তিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের গানে পরিণত হইয়াছে। এমনই একটি মনে পড়িল। গানটির আরম্ভের দুই পঙক্তি দিনুবাবুর লাইনই আছে" গানটি "কোন্ শুভক্ষণে উদিবে নয়নে অপরূপ রূপ-ইন্দু/চিত্তকুসুমে ভরিয়া উঠিবে মধুময় রসবিন্দু।" এই চমকপ্রদ তথ্যের সঙ্গে জীবনময় এ-ও জানিয়েছেন যে, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন—কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরি একটি চতুর্দশপদী লিখে রবীন্দ্রনাথের কাছে সংশোধনের জন্যে নিয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথের কবিতার প্রতিটি পঙক্তি কেটে নিজের পঙক্তি লিখে সব শেষে প্রমথনাথের নামটিও কেটে নিজের নাম সই করেন। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, হাতের লেখার ফ্যাক্সিমিলি বা হুবহু প্রতিলিপি ছাপার জন্যে ইওরোপে বসে 'লেখন' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহভাজন প্রিয়ম্বদা দেবীর চারটি কবিতা ও একটি কবিতার দুটি পংক্তি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর অসাধারণ বিস্মরণশক্তির কথাও জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আর কোন্

কোন্ গান দিনেন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে, তা আজ জানবার উপায় নেই। কিন্তু যাঁর কাজ রবীন্দ্রনাথের গানের প্রেরণা হতে পেরেছিল, তাঁর কবিতার প্রসাদগুণ কি, তা অনুমেয়।

দিনেন্দ্রনাথ উনিশ শতকের জাতক। উনিশ শতকেই তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন। বলা বাহুল্য তিনিও ছিলেন বাগ্গেয়কারক কবি। গীতিকাব্যের সুরাবয়ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অত্যুত্তম। তাঁর লেখা গান "তোমার সূতায় গেঁথে লব", "পথ পাশে মোর রচিনু দেউল", "এবে উৎসবপ্রাঙ্গণ আজি" ইত্যাদি চোদ্দোটি সুরারোপিত গানের বাণী ও সুর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত। ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিস্বিকতা এমনই ছিল যে তাঁরা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেউ কাউকে অনুসরণ না করলেও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবধি সবার মৌলিক রচনা ও সুরের মধ্যেই পাওয়া যেত পরিবারের ঋদ্ধ রূপটি। এই পরিবারে দ্বারকানাথ থেকে সৌম্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রতিটি প্রজন্মের পুরুষেরা ছিলেন সংগীতে পারদর্শী। ম্যাক্স্মুয়েলার দ্বারকানাথের মুখেই প্রথম ভারতীয় সংগীত শোনেন। এ দেশে ইওরোপীয় সংগীতের অন্যতম প্রথম অনুরাগী ছিলেন দ্বারকানাথ। গৃহ-পরিসরে শিল্প-সংস্কৃতির বিশদ আয়োজনের দরুন বাল্যকাল থেকে এই পরিবারের সদস্যেরা একাধিক সৃজনমূলক তৎপরতায় আগ্রহী হয়ে উঠতেন স্বাভাবিকভাবেই।

রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভৃত্য-রাজকতন্ত্রে মানুষ হয়েছিলেন, দিনেন্দ্রনাথ আদৌ তা হননি। প্রপিতামহ-পিতামহ-পিতার সঙ্গে জমিদারের পরিবারোচিত পোষাকে তাঁর গ্রুপ ফটোগ্রাফ আছে; রবীন্দ্রনাথের তা নেই। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে এমনই একটা ধারণা দিয়েছিলেন যে, পিতা ও অভিভাবকেরা তাঁদের যাবতীয় গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করলেও তাঁদের দেখভালের, পোশাক-আশাকের ভার চাকর-বাকরদের ওপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর তাঁরা অনাদরে অবহেলায় অমনি-অমনি মানুষ হয়েছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ আদৌ তা হননি। চূড়ান্ত আদরে আশকারায় আরামে তিনি তো মানুষ হয়েছিলেনই, অধিকন্তু তাঁর ছিল নিজস্ব খাসবরদার, টাট্টুঘোড়া। যে ঘোড়ায় চেপে একবার বালক বয়সে তিনি 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয়ে দস্যুদলের সঙ্গে মঞ্চেও প্রবেশ করেছিলেন। বখে যাবার বিস্তর সুযোগ জমিদার বাড়ির ছেলের ছিল এবং তিনি বৃদ্ধ পিতামহের অনুক্রমে প্রজন্মের জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তান হিসেবে, হবু জমিদার হিসেবে ওই সময়ের আর দশটা জমিদারের মতো হতে পারতেন। কিন্তু তিনিও পিতামহ ও পিতার সঙ্গে কলকাতার সমস্ত আরাম, ইয়ার-দোস্তের আড্ডা আর হরেক ফূর্তির প্রলোভন বিসর্জন দিয়ে সেই বিশ শতকের একেবারে শুরুর মরুভূমিপ্রায়, বন্ধু-বান্ধবহীন লোকবসতিবিরল শান্তিনিকেতনে স্বেচ্ছায় চলে এসে লেগে গেলেন রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি লেখার আর রবীন্দ্রনাথের গান শেখানোর কাজে। বন্ধুরা কলকাতা থেকে গেলে তাঁর মজলিশ জমে উঠত, তাতে সংগীতচর্চা হত, তাৎক্ষণিক কবিতা মুখে মুখে তৈরি হত। জমিদার হওয়ার অধিকার তাঁর জন্মগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিনা বেতনে শান্তিনিকেতনের সেবা করলেন। সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথদের জমিদারির প্রাপ্য অংশ নিজেদের

নামে লিখিয়ে দিনেন্দ্রনাথকে তাঁদের দেওয়া মাসোহারার ওপর নির্ভরশীল করে তুললেন। দিনেন্দ্রনাথ দু-দুবার ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েও ব্যারিস্টারি ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে পড়ে রইলেন। তাঁর এই ত্যাগব্রতের কথা পরিবারের লোকেরা দেখেও দেখলেন না। গগনেন্দ্রনাথ-সমবেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের তরফে সাজাদপুর ছেড়ে দেওয়ার বেদনা রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারেননি। 'চৈতালি'র কবিতায় কবিতায় তাঁর বেদনা কখনও ক্রোধও হয়ে উঠেছে। অথচ গগনেন্দ্রনাথেরা তাঁদের হকের জমিদারিই পেয়েছিলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে বঞ্চনাব বেদনা দিনেন্দ্রনাথ তাঁর কোনও বচনাতেই প্রকাশ করেননি। এমন সংযম রবীন্দ্রনাথও দেখাননি। বাল্যে ও তরুণ বয়সে দিনেন্দ্রনাথ অত্যন্ত উদ্দণ্ড ছিলেন। এ কারণে তাঁকে একবার স্কুল থেকে ছাড়িয়েও আনতে হয়েছিল। তাঁব কাব্য-প্রতিভা অভিভাবকদেব তত্ত্বাবধান বিনা, তাঁদের অগোচরেই বিকশিত হয়েছিল। 'ভাবতী', 'বালক', 'সাধনা' প্রভৃতি পারিবারিক সাহিত্যপত্রিকা বাড়ির লোকদের রচনার আশ্রয় হিসেবে বস্তুত প্রকাশিত হলেও দিনেন্দ্রনাথ পারিবারিক পত্রিকার নির্ভরতায় সাহিত্যসেবা কবেননি। তাঁব সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা, রবীন্দ্রসংগীতের চর্চার মধ্যে যেমন বহুমুখী প্রবণতার প্রকাশ পেত, তেমনি তাঁর নিজস্ব কাব্যচর্চা, সংগীতরচনা ছিল একান্তই অন্তর্মুখী। নিজেকে তিনি আপন সৃষ্টির মাধ্যমে বাইরের গোচরে সহজে আনতে চাইতেন না, ফলে তাঁর কবি ও গীতিকার পরিচয় ছিল আবৃত, গোপন।

কাব্য-সংকলকেরা তাঁর প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। কেবল উনিশশো আটত্রিশে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে' দিনেন্দ্রনাথ-রচিত 'সংগীত' কবিতাটি সংকলিত হয়েছিল। তাঁর প্রতি এই ঔদাসীন্যের কারণও এই যে, বাঙালি তাঁকে কবি হিসেবে যত না জেনেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জেনেছে রবীন্দ্রনাথের সকল নাটের কাণ্ডারী, সকল গানের ভাণ্ডারী হিসেবে।

দিনেন্দ্রনাথ খুব বেশি কবিতা না লিখলেও তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্যের সমাবেশ যথেষ্ট। কবিতা থেকে কবিতায় তিনি অক্ষরবৃত্তের নানা চাল নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। যেমন,

"কোথা জ্বালা জুড়াবার ঠাঁই! কোথা অতল সলিল!
কোথা সেই চির-প্রেম-রস-ধারা পূত, অনাবিল", এ ৪।৪।৪।৪।২;

*

"ভিখারি কহে তোমারি দ্বারে
এসেছি কতদিন
গেয়েছি কত দুখের গান
তবুও উদাসীন", এ ৫।৫।৫।২;

*

"কেঁদে কেঁদে ফিরে গহনে গহনে প্রাণ
খুঁজে হয় হারা, নাহি পায় সন্ধান", এ ৬।৬।২

*

"আঁখির দুয়ারে আলো আসি বলে
মোরে বয়ে লও, বয়ে লও,

অন্তরে মোর তারে দেখি বলে

ওগো তুমি নও, তুমি নও", এ ৬।৬।৬।৪, ইত্যাদি

অজস্র বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মতো। মিলের ব্যাপারে তিনি কখন আমাদের চমকে দেন। যেমন, "সেই সুধাকর/বিরহে কাতর", "এ উৎসবে/ফুল সৌরভে", "কি সান্ত্বনা/আনাগোনা", "মনমত/অনুগত", ইত্যাদি অনায়াস অথচ সুন্দর মিল।

"তোমার কাব্য পড়ে যখন

আপন মনে মিল গাঁথি

তোমার ভাবে তোমার ভাষায়

তোমার ছন্দে ইত্যাদি...

...তোমার সুরে মিল করে সুর

গাইতে চাই যে একসাথে

সবগুলো গান হয় না শেখা

গোল বাঁধে ওই একটাতে..."

—ইত্যাদিতে এক ধরনের অনায়াস সরলতা আছে। তাঁর কবিতা পড়ে মনে হয়, প্রথম আবেগে যা-ই কলমের মুখে বেরিয়ে আসত, তিনি তার ওপরে আর হস্তক্ষেপ করতেন না। আবেগের প্রাথমিক প্রকাশের সেই স্বাভাবিকতা তাঁর কবিতায় আছে, যেখানে তিনি রবীন্দ্রানুসারী নন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছায়া যখনই তাঁর কবিতায় পড়েছে, বহির্জাগতিক চিন্তা তখনই তাঁর কবিতায় এসেছে, তখন তাঁর কবিতার মেজাজ পালটে গিয়েছে, যেমন:

"হে ভারত! তোমার এ শ্যাম-স্নিগ্ধ ছায়া-কুঞ্জ 'পরে
কুসুমে পল্লবে ধান্যে বিকশিত উদার প্রান্তরে,
যে মহান গ্রন্থখানি সম্মুখেতে রাখিয়াছ খুলি
তার ভাষা দাও শিখাইয়া। ...",

কিংবা

"তোমার এ পুণ্যস্বচ্ছ জাহ্নবীর তীরে
হে বঙ্গজননী! তব কুটিরে কুটিরে
যে পুরানো শান্ত শক্তি ছিল সঙ্গোপনে...",

কিংবা

"কর্ম ক্লান্ত বৎসেরর শেষ রশ্মি-শিখা
অস্ত গেল। উর্ধ্বে হের কার অনামিকা
অঙ্গুলি ফিরিল আজি পূর্বাচল পানে ...'

—ইত্যাদি কবিতায়। কিন্তু এ ধরনের গাম্ভীর্যভরা কবিতা তিনি সামান্য লিখলেও এই সকল কবিতা অঙ্গুলি নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের দিকে। 'নৈবেদ্য' থেকে 'গীতাঞ্জলি'র মেসায়া বা মসীহাপ্রতিম রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই রোমান্টিসিজমের জন্যে ইওরোপে সমাদৃত হয়েছিলেন কারণ এই রোমান্টিসিজম এসেছিল ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে ইওরোপ থেকে। অতীতকেই গ্রহণীয় আদর্শ মনে করে ভাবনার অভিমুখ বর্তমান জগৎ থেকে এবং রক্তমাংসের কামনা-বাসনা

থেকে কল্পলোকে ও অধ্যাত্মজগতে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা উনিশ শতকে বাংলা কাব্যে এসেছিল ইংরেজি পড়ুয়া কবিদের মাধ্যমে। উনিশ শতকের জাতক কবিরা কেউই এই রোমান্টিক আবেশ থেকে মুক্ত তো ছিলেনই না এমনকি বিশ শতকের প্রথম দিকের জাতকেরাও এহেন রোমান্টিক আবেশে আচ্ছন্ন ছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথের কবিতায় এই সুরটি ভাসমান মেঘের মতো, তাঁর কবিতার স্থায়ী রস এটি নয়। ভরত যে বিষয়ের সঙ্গে ঐকাত্মলাভের ভিতর দিয়ে সকল সামাজিকের একঘনতার কথা বলেছেন, দিনেন্দ্রনাথের কাব্যের সেই একঘনতা হচ্ছে শোক। তাঁর কাব্যের চিত্তজগতে আমরা তাঁর যে স্বাভাবিকমূর্তি দেখি, সেই চিত্তজগৎ শোকের হাহাকারে পরিপূর্ণ। এই শোক কখনও পরিহাসবিজল্পিত, কৌতুকের আবরণে ঢাকা, কিন্তু সমস্ত আচ্ছাদন ছিন্ন করে তাঁর শোকের স্পর্শ পাঠকের হৃদ্‌দুয়ারে লাগে।

ঠাকুরবাড়িতে পত্রকাব্যের রেওয়াজ সম্ভবত শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ এবং দিনেন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথ। তিনি তলবি চিরকুটও লিখতেন কবিতায়। বুয়োনোস্ এয়ারিস থেকে উনিশশো চব্বিশে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ পত্রকাব্য দিনেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, যেটি 'পূরবী'তে 'চিঠি' নামে মুদ্রিত হয়েছে। এই কবিতার বিখ্যাত পঙক্তি "মেশিনগানের সম্মুখে গাই জুঁইফুলের এই গান।" বলা বাহুল্য, দিনেন্দ্রনাথের জীবিতকালের কোনও রাষ্ট্রনৈতিক বা বাহ্যিক দোলাচল তাঁব কবিতায় তরঙ্গ তোলেনি। তাঁর কবিতা ছিল জুঁই ফুলেরই মতো স্মৃতিসুরভিত। এর পূর্বে ইওরোপ প্রবাসকালেও রবীন্দ্রনাথ ছোটো ছোটো পত্রকাব্য দিনেন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথও পত্রকাব্য লিখতেন যার মাত্র কয়েকটিই প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে নন্দলাল বসু, মৈত্রেয়ী দাশগুপ্ত (দেবী) ও অমলা দত্ত (রায়চৌধুরি)-কে লেখা কয়েকটি পত্রকাব্য সংকলিত হল, কারণ পত্রকাব্য দিনেন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য বহন করছে। উনিশশো একুশের পয়লা জানুয়ারি গোয়ালিয়র রাজের আমন্ত্রণে নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর—শান্তিনিকেতনের এই তিন চিত্রকর গোয়ালিয়র রাজ্যের ভিল জনজাতি অধ্যুষিত পাহাড়ি এলাকায় বাগ গুহার ভিত্তিচিত্রের অনুলিপি বা নকল তুলে আনতে গিয়েছিলেন। সেই সময় দিনেন্দ্রনাথ যে পত্রকাব্য লিখেছিলেন তাতে দিনেন্দ্রনাথের সরস চিত্তের দেখা মেলে। কৃষ্ণকায় নন্দলালকে তিনি ভিলেদের মথুরার কৃষ্ণ বলেছিলেন। সিগারেটখোর সুরেন্দ্রনাথ তখনও অবিবাহিত ছিলেন বলে তাঁর উল্লেখ দিনেন্দ্রনাথ "শচীশূন্য সুর" হিসেবে করেছিলেন। তরুণী ভার্যাকে ফেলে তরুণ অসিতকুমার গিয়েছিলেন, তাই তাঁর বিরহ তাপের উল্লেখ দিনেন্দ্রনাথ করেছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতনের চা-চক্রের চক্রবর্তী। অসিতকুমার, নন্দলাল এঁরা দিনেন্দ্রনাথের চা-চক্রে যোগ দিতেন। এই চা-চক্র আনুষ্ঠানিকভাবে যখন উদ্বোধিত হয়েছিল তখন সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ "হায় হায় হায় দিন চলি যায়" গানটির ছত্রে ছত্রে চা-রসিকদের বর্ণনা দিয়েছিলেন। অসিতকুমার অত্যন্ত চা-প্রিয় ছিলেন, এ কারণে দিনেন্দ্রনাথ তাঁকে রসিকতা করে 'চাতাল' বলেছিলেন।

অমলা দত্ত (রায়চৌধুরি)র ডাকনাম ছিল কুইনি। রবীন্দ্রসংগীতের এই গায়িকা শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথের ছাত্রী ছিলেন। কুইনির পিতা রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত ছিলেন অসমের প্রভাবশালী মন্ত্রী। কুইনি সিলেটে বা শিলঙে গেলে দিনেন্দ্রনাথকে ঝুড়ি ভরে কমলালেবু পাঠাতেন। দিনেন্দ্রনাথ যখন মাসোহারার বরখেলাপে বিড়ম্বিত ও বেদনাহত হয়ে শান্তিনিকেতন চিরতরে ছেড়ে কলকাতায় আপন-অধিকার বিচ্যুত পৈতৃক ভদ্রাসনে রবীন্দ্রনাথের ভাড়াটে হিসেবে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করছিলেন, যখন প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীই তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন, তখন অমলা/কুইনি তাঁকে একঝুড়ি কমলালেবু পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অমলা চিঠি লেখেনি। কমলালেবুর প্রাপ্তির জবাবে দিনেন্দ্রনাথ পত্রকাব্যে লিখেছিলেন,

"ওগো অমলা দত্ত
চিঠি লেখা কেন বন্ধ, এর কিবা অর্থ?
দিই নি জবাব?
কুঁড়েমি করা যে চিরকালের স্বভাব।
দয়া করে করো ক্ষমা
মোরে নিরুপমা।...
... ভাব কি কুইনি
কমলা খাবার কালে আঁখিজলে তাহারে ধুইনি?"

মৃত্যুর চারমাস পূর্বে লেখা এই পত্রকাব্যের কৌতুকের মধ্যেও কৃতজ্ঞতার আনন্দাশ্রু বয়েছিল শেষ দুটি পংক্তিতে। দিনেন্দ্রনাথ-কৃত রবীন্দ্রনাথের শেষ স্বরলিপিটি "আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্য-পানে চেয়ে আছে।" এ গানে যেন দিনেন্দ্রনাথের এক প্রতীকী জীবনী রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেলেছিলেন আপনার সম্পূর্ণ অগোচরে। আপন জীবনের সলতে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রদীপ দিনেন্দ্রনাথ জ্বালিয়েছিলেন; নিজের আলো তাই তিনি নিবিয়ে দিয়েছিলেন। প্রপিতামহ তাঁর নাম রেখেছিলেন দীনেন্দ্রনাথ। প্রপিতামহ দেবেন্দ্রনাথের জীবিতকালে বাড়িতে একটিও উচ্চস্বর শোনা যেত না, তাঁর কথা ছিল বেদবাক্য। কেউ তাঁকে অমান্য করার কথা ভাবতেও পারতেন না। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর এগারো বছর পর রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী'র উৎসর্গপত্রীতে দীনেন্দ্রনাথের নামের দ্বিজত্ব ঘটালেন দিনেন্দ্রনাথ বানানে। রবি দিনপতি। সেই থেকে আপন বাতি দিনেন্দ্রনাথ বলতে গেলে নিবিয়েই দিলেন। প্রিয় ছাত্রী রমা মজুমদার (কর) এর মৃত্যুশোকে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন, সেটি বহুল প্রকাশিত। দিনেন্দ্রনাথ যে শোক-কবিতা 'রমা-স্মরণে' লিখেছিলেন সেটি আমাদের ভেতর থেকে কাঁদায়।

আরেকবার অমলার পাঠানো কমলা পেয়ে কমলাকান্ত দিনেন্দ্রনাথ অর্থাৎ কমলা দেবীর পতি দিনেন্দ্রনাথ কৌতুকভরে লিখেছিলেন,

"অমিয়া অমলা
পাইয়া কমলা
লিখিছে কমলাকান্ত
দ-এ হ্রস্ব ই—ন এ আকার, ন এ দ এ রফলা,

নিফল জীবনমম হল আজি স-ফলা
দলিয়া কমল করে
রসালয়ে সমাদরে
দিল যবে করিবারে পান..."

ইত্যাদি। অমলার দিদি অমিয়া দত্ত (মজুমদার) ছিলেন শৈলরঞ্জন মজুমদারের পত্নী। তাঁর ডাকনাম ছিল ঘুঘু। তাঁর উল্লেখ এই পত্রকাব্যে আছে। পত্নী কমলা তাঁকে অমলার পাঠানো কমলার রস করে খাইয়েছিলেন সেই কথাই এই পত্রকাব্যে সকৌতুকে বর্ণিত হয়েছিল। উনিশশো চারে ইংল্যান্ডে যাওয়ার পথে এডেন বন্দর থেকে দুই কাকিমা চারুবালা ও সুকেশী-কে এক চিঠিতে দিনেন্দ্রনাথ কৌতুক করে লিখেছিলেন,

"নাহি ঘাস নাহি তরু
নাহি বাড়ি নাহি মরু
নাহি পক্ষী নাহি গোরু।"

রবীন্দ্রনাথের নাতনি নন্দিতা/বুড়ি-কে এক পত্রকাব্যে চিঠিতে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত 'ঋতুরঙ্গে'র বর্ণনা দিতে গিয়ে দিনেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

"চলিল কলম উঁচিয়া
স্বগৃহে অশ্রু মুছিয়া
উৎসাহ গেল ঘুচিয়া।"

দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতনের উৎসবপতি। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক প্রবর্তিত যাবতীয় নতুন উৎসবের আবয়বিক রূপদানে দিনেন্দ্রনাথের সহযোগিতার কথা রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন। আনন্দদানে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ ও অকাতর। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর মধুর ব্যবহারের নানা কথা নানা জনে লিখেছেন। কিন্তু সমস্ত আনন্দের অন্তরালে বিরহের যে অশ্রুবিন্দুটি টলমল করত তার আভাস রয়েছে তাঁর কবিতায়। বিরহের এমন শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ বাংলা কবিতায় কমই আছে। কেবল রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি লেখার জন্যেই নয়, কবি হিসেবে আপন দাবিতেই তিনি স্মরণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল থেকেও তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে অম্লান ছিলেন। তাঁর গানের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। এই গানগুলির বাণী যেমন রবীন্দ্রধারা থেকে স্বতন্ত্র তেমনি এগুলির সুরও রাবীন্দ্রিক নয়। রসিকজন যাতে স্বরলিপির সহায়তায় এই সুরের নিজস্ব রূপটি উপভোগ করতে পারেন, এ কারণে গানগুলির স্বরলিপিও এই সঙ্গে মুদ্রিত হল। মুদ্রিত হল দিনেন্দ্রনাথের দুটি নিবন্ধ, যা সংগীতের তত্ত্বগত আলোচনা হিসেবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

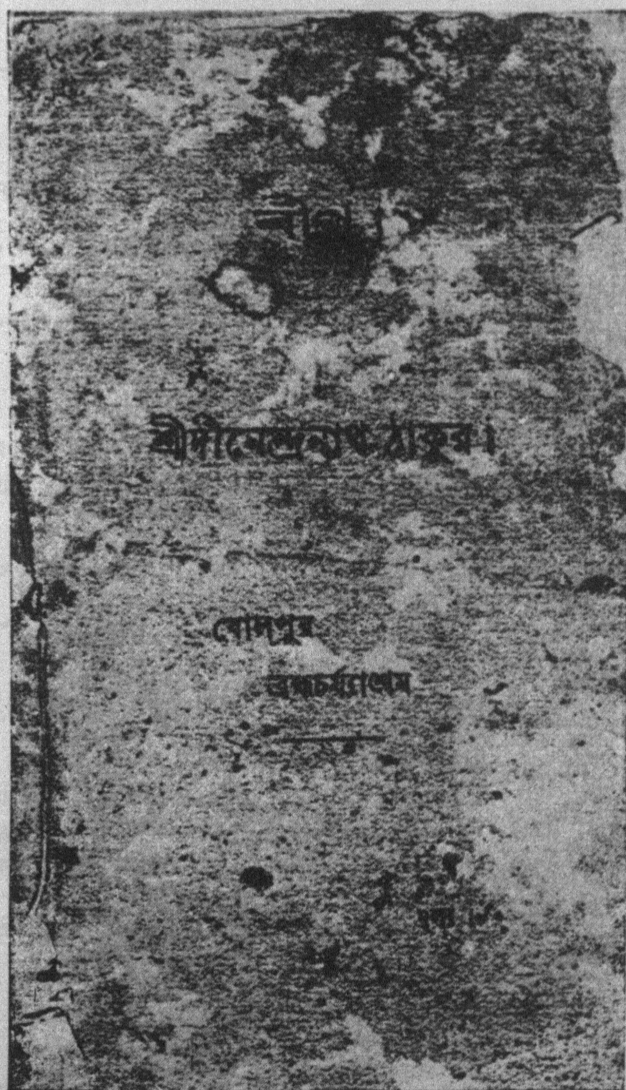
২ জানুয়ারি, ২০০২ শোভন সোম
পি-৩৭ সি.আই.টি. রোড
ফ্ল্যাট ৭, কলকাতা ৭০০ ০১০

সূচিপত্র

বীণ

বিবিধ কবিতা

গান ও স্বরলিপি


শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বোলপুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

'বীণ' কাব্যগ্রন্থের নামপত্র।

নীরব বীণা

মোর নীরব বীণা কতকালের
কত না অনাদরে,
ও সে তোমার সভা-গৃহের কোণে
রয়েছে একা পড়ে।

কেন যে আছে জানে না তাও,
এবার তারে বুঝায়ে দাও ;
কি সুরে হাসে, কিসে কাঁদাও,
নিজ ইচ্ছা ভরে!

ও সে তোমার সভা-গৃহের কোণে।
রয়েছে একা পড়ে!
তুমি আপন কোলে লহ তুলে
এ যে তোমার বীণা,
দেখ তোমার সুরে মিলিয়ে সুর
এবার বাজে কিনা!

আপনি যবে বাজাতে যাই,
বেসুর বেজে ওঠে সদাই
রেখেছি আশা লইবে তায়
তুলিয়া নিজ করে,
ও সে তোমার সভা-গৃহের কোণে
রয়েছে একা পড়ে।

বন্ধন

সেদিন যে তুমি গিয়েছিলে খুলে চুলটি,
দুলায়ে করেতে মোহন কমল ফুলটি,

একটি ক্ষুদ্র পাপ্‌ড়ি তাহার,
খসে পড়েছিল বক্ষে আমার,
বেগে বহেছিল পরশে যাহার
আমার হৃদয়-ধমনী,
হে মোর চিত্ত-হরণি!

কি জানি কানেতে বেজেছিল কোন কথা কি!
শুনিতে তাহাই আজি এ মরম ব্যথা কি!
সব কাজে আজি এ মোর পরান
ব্যাকুল শুনিতে তব প্রেমগান ;
কর আজি মোরে, কর আহ্বান
বাহি এসো তব তরণী!
হে মোর চিত্ত-হরণি।

একবার শুধু মিলাও আঁখিতে আঁখিটি,
কর মোরে তব স্বর্ণ খাঁচার পাখিটি!
বদ্ধ করিও শৃঙ্খলে তব,
তোমার বন্দী চিরদিন রব ;
অনিমেষে তব মুখ অভিনব
হেরিব দিবসরজনী!
হে মোর চিত্ত-হরণি।

এমনি রহিব চিরদিন মোরা দু-জনায়,
তুমি গো মুক্ত, আমি বাঁধা তব পিঁজরায়!
অক্ষয় থাক্ এ মোর বাঁধন,
অনন্ত হোক্ এ প্রেমসাধন!
আশাভরা মোর আকুল কাঁদন
চেয়ে আছে তব শরণি!
হে মোর চিত্ত-হরণি!

হৃদয় তীর্থ

সখি, প্রতিদিন তুমি মেলেছ নয়ন
উষার উদয় পানে গো ;
কত না প্রভাতে আকুল শ্রবণ
কত বিহঙ্গ গানে গো!

হিমভারাতুর কুসুমের হিয়া
কত না অশ্রু ফেলেছে মুছিয়া
কত পরশন-স্মৃতি-বিজড়িত
পবন সুরভি আনে গো!
তারি মাঝে তুমি মেলেছ পরান
রজনীর অবসানে গো!

সখি, আমারও চিত্ত-উদয়-শিখরে
হের উষা নামে সুধীরে,
রাতুল চরণ শিশির-শীকরে
ওঠে ফুটে ঘন তিমিরে!
হেথাও অমল ফোটে শতদল
ঝরে ঝরঝর বরিষার জল,
কুঞ্জবিতানে ফোটে কদম্ব
নাচায়ে চিত্ত-শিখীরে!
সেথা এসো নেমে ঘন তরুছায়ে
হৃদয়ের তটে সুধীরে!

সখি, অস্ত-পারের রাঙিমা হেথায়
জ্বলে দিবসের দহনে,
আকাশে যে তারা মিটি-মিটি চায়
ফোটে তা হৃদয়-গহনে!

পূরণিমা রাতে যেই সুধাকর
রহে জাগি চির বিরহ-কাতর,
বেদনার রসে করে বিহ্বল
নিঝুম নিশীথ স্বপনে!
একা সেই জাগে আমার নীরব
আঁধার চিত্ত-গগনে!

সখি, বিশ্বহৃদয় নির্ঝরধারা
এইখানে নেমে এসেছে,
তটবন হতে কত পথহারা
ফুল-ফল স্রোতে ভেসেছে!

মহাসাগরের রূপের লহর
আছড়ে হেথায় দিবস প্রহর,
কত বিচিত্র মরমের কথা
একসুরে হেথা মিশেছে!

কত হাসি, কত অশ্রু-সলিল
এইখানে নেমে এসেছে।

সখি, হৃদয়ের নীরে নেমে এসো ধীরে
স্নান কর তব সমাপন,
হেথা সুনিভৃত গহন তিমিরে
ফেলিও চরণ সুগোপন!

তব বিরহের গীত, যত ব্যথা,
আমার মরমে লভি নীরবতা,
অকথিত ভাষে কত-না কাহিনী
হবে তোমা সাথে আলাপন!
যত কথা তব আছে,—যত গান,
হেথা এসে কর সমাপন!

আত্ম-গৃহ

হে ভারত! তোমার এ শ্যাম-স্নিগ্ধ ছায়া-কুঞ্জ 'পরে,
কুসুমে পল্লবে ধান্যে বিকশিত উদার প্রান্তরে,
যে মহান্ গ্রন্থখানি সম্মুখেতে রাখিয়াছ খুলি,
তার ভাষা দাও শিখাইয়া! অতীতের স্মৃতিগুলি,
স্তব্ধ যাহা বহুদিন, স্পন্দিত জাগ্রত করি তারে
ধ্বনিত করিয়া তোলো! এ মহান্ জলধির পারে,
দূরদূরান্তরে তার পাঠাইয়া দাও সমাচার!
অবসাদ-ক্লান্ত প্রাণে নব প্রেম করহ সঞ্চার,
নব আশা! উৎস যথা রুদ্ধ-বারি ধরা হতে টানি
উচ্ছ্বসিত করে তারে, তেমনি তোমার মহাবাণী
প্রেমের মঙ্গল ধারা বক্ষ হতে হরি লয়ে আজ
উৎসারিত করি দিবে দিকে দিকে ধরণীর মাঝ!
তুমি তো রাখনি দূরে কাহারেও, আপন যে নয়
তারেও ডাকিয়া ঘরে চিরদিন দিয়েছ আশ্রয়!
তবে কেন হে জননি, যারা তব আপন সন্তান,
ছাড়িয়া তোমার ক্রোড় পরদ্বারে পায় অপমান?
পর হতে পারে, তবু আপনারে পারে না বুঝিতে,
ঘরে শত্রু আছে বসে, যায় মূঢ় পরেরে যুঝিতে।

দুর্ভাগ্য

তোমার এ পুণ্যস্বচ্ছ জাহ্নবীর তীরে
হে বঙ্গজননি! তব কুটিরে কুটিরে,
যে পুরানো শান্ত শক্তি ছিল সঙ্গোপনে,
আজি কোন বায়ু-বেগে, কোন শুভক্ষণে
এ ধূমান্ধ নগরীর বাতায়নপথে
প্রবেশিল তারি কণা আজি কোনমতে।
সন্তানের মৃত দেহে করেছে সঞ্চার
ঈষৎ চেতনা, তাই আশা বাঁচিবার।
নাহি তবু বল মনে, নাহি বীর্য দেহে,
তাই আজি নাহি আশা এ দরিদ্র গেহে।
হিংসার প্রলয়-বাণ চাহে ত্যজিবারে
পরেরে নাশিতে ; তবু দুর্ভাগা না পারে
মঙ্গল শান্তির তরে দিতে বলিদান
আপনার স্বার্থপুষ্ট, দীনহীন প্রাণ।

আত্মদান

মধ্যাহ্নে ঘিরিয়া ছিল খর রবি-দাহ,
আঁধারিয়া ক্ষণ পরে এল বারিবাহ।
সরস অমৃতধারা বক্ষ মাঝে চাপি,
রসের আবেশখানি রেখেছিল ঝাঁপি ;
আচম্বিতে কোথা হতে অহঙ্কারে ফুলি
এল বায়ু বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ অসি তুলি।
অমনি উদার বক্ষ মেলি দিয়া তার
বরষিল তপ্ত বুকে অমৃতের ধার।
তেমনি যখন রসে ভরে যায় প্রাণ,
জানি না কেমনে তারে করা যায় দান!
হেনকালে আসে যদি আবেগ-ঝটিকা,
হানে প্রাণে বেদনার বিদ্যুতের শিখা,
অমনি সে বিগলিত প্রেমরসধারা
অবিরাম বহে, মোরে করে আত্মহারা।

জ্যোৎস্নারাত্রি

সহসা কেন ঘুমের পরশন
　　　　চক্ষে মোর লাগে?
সারাদিনের অশ্রু-বরষণ
　　　　চিত্তে নাহি জাগে!
স্বপ্নেদেখা অস্ফুট স্মৃতি-প্রায়
অতীত ব্যথা কোথায় মিলে যায়!
আকাশ জুড়ি পরান ভরি আজ
　　　　উদয় নবরাগে!
সারাদিনের অশ্রু-বরষণ
　　　　চিত্তে নাহি জাগে!

মগন দিক জোছনা সুমধুর,
　　　　তরল সুধাধারে
পরান ছাপি হয়েছে ভরপুর—
　　　　রাখিতে নাহি পারে!
চাঁদের পাশে মেঘেরা চলে ছুটি,
সোহাগে করে আলোকে লুটোপুটি
ধ্বনিয়া ফিরে সব নীরব গীত
　　　　আমার গৃহদ্বারে!
পরান ছাপি হয়েছে ভরপুর—
　　　　রাখিতে নাহি পারে!

জগৎমাঝে একাকী কে গো বসি,
　　　　এ কোন্ রাজবালা!
মাথার 'পরে জাগে শুক্রশশী,
　　　　হেরিছে মেঘ-মালা!
কোমল হাতে বীণার তারগুলি
যত্নে বেঁধে বক্ষে নেছে তুলি,
গুমরি তাই গাহিছে মৃদু তানে
　　　　রুদ্ধ কত জ্বালা!
মাথার 'পরে জাগে শুক্রশশী,
　　　　হেরিছে মেঘমালা!

আমার সাথে যেন গো পরিচয়
　　　　হয়েছে কতদিন!
আজিকে হেরি সে বাহু কিশলয়
　　　　বক্ষ 'পরে লীন!

বসন্তের মৃদুল বায়ুভরে
চমকি তার অঙ্গ থরথরে ,
পুলকে মোর কাঁপিয়া উঠে হিয়া
বাজিয়া উঠে বীণ!
আজিকে হেরি সে বাহুকিশলয়
বক্ষ 'পরে লীন।

সহসা যবে ভাঙিবে ঘুমঘোর
পাব না তার দেখা,
রাঙিয়া রবে কেবলি বুকে মোর
কর-পরশ-রেখা।
নয়ন 'পরে রবে বিরহ লোর,
স্বপন যাবে, রহিবে শুধু ঘোর ;
সঙ্গীহারা রহিবে হেথা পড়ি
ছিন্ন বীণা একা!
রাঙিয়া রবে কেবলি বুকে মোর
কর-পরশ-রেখা!

রূপান্তর

বসন্ত-আবেগ-শ্রান্ত প্রান্তরের 'পরে
নীরবে নামিল সন্ধ্যা ; পূরবীর স্বরে
সকল মুখর ভাষা দিল মৌন করি।
শান্ত বনচ্ছবি। চন্দ্র কিরণ-পাপড়ি
সহসা খুলিল নভে। স্বপ্নসম সব
ঘেরিয়া ধরিল মোরে নিবিড় নীরব!
জানিনা তখন কার প্রেম আলিঙ্গনে
ছিলাম মগন ; তার নয়নের কোণে
আমার সকল ব্যর্থ বিরহের তান
লভিল পুলকভরে চির অবসান।
প্রভাতে ভাঙিল ঘুম বিহঙ্গের গানে,
মেলিয়া নয়ন মোর হেরি ঊর্ধ্বপানে,
নব জাগরণে ভরি আকাশের বুক,
সেই বাহু সুকোমল, সেই হাসিমুখ।

যাত্রা

রব দূরে, তবু নহে প্রবাস যাপন,
গৃহ হতে গৃহান্তরে কেবলি গমন।
হে বিশ্ব-গৃহের লক্ষ্মী! তোমার সংসার
পরিপূর্ণ জলে-স্থলে, নাহি অন্ত তার।
অসীম এ পারাবারে বিম্বসম ভাসি,
কভু দুঃখে কেঁদে মরি, কভু সুখে হাসি!
তোমার মঙ্গল-রূপ সুখদুঃখ মাঝে,
সব ঠাঁই সব ক্ষণে নিয়ত বিরাজে!
তব শিশু নহে বদ্ধ অঞ্চলের ছায়!
উন্মুক্ত বিশ্বের পথ ; যেথা প্রাণ চায়
রয়েছে অবাধ গতি! তোমার এ দান,
সব বাঁধ টুটি রবে চির পরিত্রাণ!
গৃহ হতে দীন নেত্রে বিদায়ের কালে
হে কল্যাণি! তব টীকা আঁকি দিয়ো ভালে।

মিলন

শুনেছিনু রূপকথা, রাজবালা কবে কোন্ বনে
ঘুমন্ত নগরী মাঝে সুপ্ত ছিল কুসুমশয়নে।
ছিল যত তরুলতা, যেন বৃদ্ধ তাপসীর মতো,
ঝড়ে রৌদ্রে সমভাবে ছিল সব মাথা করি নত।
হেনকালে কোথা হতে রাজপুত্র হারাইয়া পথ,
বনেতে প্রাসাদ হেরি, টানি অশ্ব থামাইয়া রথ,
পশিল বনের মাঝে। দেখে যেন হয়ে মন্ত্রাহত,
কে এ অরণ্যের মাঝে বসন্তের ফুলটির মতো?
থাকিতে নারিল যুবা ; আগ্রহে ধরিল তার কর,
শিরহি উঠিল বালা ; বনেতে ধ্বনিল কুহুস্বর,
চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল ফুল, আনন্দেতে
লতা হেলে দোলে,
বনদেবী আসি সেথা হাসিয়া পড়িল যেন ঢলে।
মিলন হইল দোঁহে, বারতা হইল আগুয়ান্,
ভাসাইয়া দুইকূল প্রেমের নদীতে এল বান
জগতের আদি হতে এইরূপ ঘটয়ে প্রমাদ,
সাগরে মিলয়ে নদী বেগভরে, নাহি মানে বাঁধ।

তাহারা মিলিয়া দোঁহে, এমনি জাগায়ে তুলি ধরা,
দোঁহার জীবনপথ করিল গো সুবাসেতে ভরা।

দুইটি হৃদয়

একি এ লীলা প্রেমময়,
ভুবনশাখে জাগালে দুটি পুলকভরা কিশলয়।
তোমার উষা নয়ন পানে
চেয়েছে দোঁহে মুগ্ধ প্রাণে,
বাতাস তব বারতা বহি
দোঁহার প্রাণে কি যে কয়!
ডুবালে আজি কি রসধারে নবীন দুটি কিশলয়!

বাঁধন নাহি টুটিবে ;
হৃদয় দুটি মিলিয়া গিয়া কুসুম হয়ে ফুটিবে।
হৃদয়দেব! পূজার তরে
গন্ধ তার পড়িবে ঝরে,
আপনা ভুলি সে দলগুলি
চরণতলে লুটিবে,
নবীন দুটি হৃদয় যবে একটি ফুলে ফুটিবে!

অসীম স্নেহে ঢাকিয়ো!
ফুলের পাতে প্রেমের মধু গোপনে ভরি রাখিয়ো!
সুখের দিনে, দুখের রাতে,
মলয় বায়ে, ঝঞ্ঝাবাতে,
কিরণময় বীণার রবে
তোমারি পানে ডাকিয়ো!
প্রেমের মধু রাখিয়ো হৃদে ভরিয়া, তুমি রাখিয়ো!

শরতের গান

আজকে আমি ধরবো তোমায়,
প্রাণ ভরে আজ বাসবো ভালো,
ওগো, ছিন্ন মেঘের খেলার সাথী
মন-ভুলানো পুবের আলো!

ডুবিয়ে মাঠের এপার-ওপার
এল রে আজ কিরণ-জোয়ার!
বিরাম নাইকো পুবে হাওয়ার
ভাস্‌ছে মেঘের ধবল তরী
যেন রে কোন্‌ সফল মিলন
বাজায় শঙ্খ গগন ভরি।
আজ আলো আর মাঠের সঙ্গে
পান্না-সোনার মাখামাখি,
ফুলের গন্ধে, গানের ছন্দে
বিশ্বে প্রাণে ডাকাডাকি।
ভরা ভাদ্রে জলে-স্থলে,
নির্মল নীল আকাশতলে,
বর্ষা বিদায় অশ্রুজলে
পড়েছে আজ কি সান্ত্বনা!
কান্নাহাসি গলাগলি
হাওয়ায় করে আনাগোনা।
ধরবো আমি, ধরবো তোমায়,
প্রাণ ভরে আজ বাসবো ভালো,
ওগো, ছিন্ন মেঘের খেলার সাথী,
মন-কাঁদানো পুবের আলো!

অবসর

কে বাজালে মোহন বাঁশি!
দুলিয়ে শাদা কাশের রাশি,
ছড়িয়ে দিল শুভ্র হাসি
শারদ নীলিমায়!
ধরার পরে কোমল চরণ
বুলিয়ে গেল সবুজবরন,
ক্ষেতভরা ধান লুটিয়ে বরন
করল তারি পায়।

পটে আঁকা গাঁয়ের বুকে
আলোছায়া পড়ল ঝুঁকে ;
উঠল ফুটে সবার মুখে
হাসির কলকল।

আজ সকালে কলসি কাঁখে,
চেয়ে আধেক ঘোম্‌টা ফাঁকে,
সবুজঘেরা দীঘির বাঁকে
চলল স্নানের দল।

দীঘির জলটি শিউরে উঠে,
হাতের ঘায়ে পালায় ছুটে,
ফিরে-ঘিরে চায় রে লুটে
নিতে সরমখানি।
কখন-বা সে ছল্‌কে ভুলে
পড়ছে গিয়ে এলো চুলে,
কখন-বা দুই বাহু তুলে
আঁচলটি লয় টানি।

আলোর সোহাগ আন্‌তে কাড়ি,
আকাশে মেঘ দিচ্ছে পাড়ি ;
ডানা মেলি বকের সারি
যাচ্ছে যেন উড়ে।
ভুরুর মতো কৃষ্ণ রেখা
জলের 'পরে যাচ্ছে দেখা ;
আলোক-উজল পথটি বাঁকা
ওই দেখা যায় দূরে।

মেঘ ও জলের ঢেউয়ের মেলা,
এমনিতর কতই খেলা
খেল্‌ছে আজকে সকালবেলা
ঠিকানা তার নেই!
ছায়ার মায়ায়, আলোর নাচে,
আকাশজোড়া খেলার কাছে
মন হারিয়ে বসে আছে
সকল কাজের খেই।

প্রতীক্ষা

আছে ওগো আছে!
যা আছে তা লুকিয়ে আছে
আমার হিয়ার কাছে!

ইচ্ছে করে বাহির করে
চাইতে মুখের পানে ;
নয়ন-দুটি করতে কাজল
সোহাগ তুলির টানে ;
গুন্‌গুনিয়ে মনের ব্যথা
শোনাতে তার কানে।
পারিনা যে—সে কয় কেঁদে
সদাই আমার প্রাণে—
আছে ওগো আছে!
যা আছে তা লুকিয়ে আছে
আমার হিয়ার কাছে!
বধূরে মোর আন্‌তে যে চাই
ভিতর হতে কাড়ি,
শাঁখ বাজিয়ে করবে বরণ
যতেক পুরনারী ;
কইব কত গোপন কথা
মনের কথা তারই,
হায় রে সে কয় করুণ সুরে
মুছে নয়নবারি—
আছি ওগো আছি!
কইব কথা, এম্‌নি রব
হিয়ার কাছাকাছি!
জনশূন্য পথে যখন
বাহির হলেম সাঁঝে,
বনের ধারে জোনাক-জ্বালা
ঝিঁঝি-ডাকার মাঝে ;
সাঁঝের সুরটি ফুটল যখন
তারার মোহন সাজে,
আমার হিয়ার তন্ত্রী তখন
গুম্‌রে-গুম্‌রে বাজে—
আছে ওগো আছে!
বিরহের গান গাচ্ছে বসে
তোমার হিয়ার কাছে!
বধূ আমার লুকিয়ে আছে
গোপন হৃদয়পুরে ;
কেমন করে নাব্‌বো সেথা
সে যে অনেক দূরে।

খুঁজে আমি পাই না তারে
মর্‌ছি মিছে ঘুরে!
শুন্‌ব কবে বাজ্‌বে যবে
বীণা মিলন সুরে—
আছি ওগো আছি!
আমার কণ্ঠে দাও পরায়ে
তোমার মালাগাছি।

বর্ষশেষ

কর্ম-ক্লান্ত বৎসরের শেষ রশ্মি-শিখা
অস্ত গেল! ঊর্দ্ধে হের কার অনামিকা
অঙ্গুলি ফিরিল আজি পূর্বাচল পানে।
আজিকার বিদায়ের রাত্রি অবসানে
অতিথি আসিবে দ্বারে! তারি তরে হিয়া
আকুল-বিস্ময়ভরে আছে প্রতীক্ষিয়া।
সারা বিশ্বে অভ্র-ঘেরা স্তব্ধ আয়োজন
শেষ অর্ঘ রচিবারে। ওগো পুরাতন!
নিত্য নব নবরূপে তোমার প্রকাশ,
চিরন্তন লীলা মাঝে নাহি অবকাশ,
তবু বিশ্ব মিলনের পূর্ণতার তরে
বিদায়ের অশ্রু ঢালে ঋতু সম্বৎসরে।
সব শূন্য করে আমি রচি দিনু স্থান,
ব্যর্থ আশা জীবনের চরম সম্মান।

নববর্ষ

কল্যাণের শুভস্পর্শে হোক সুপ্রভাত,
ভগ্ন হৃদয়ের দ্বারে পুণ্য-রশ্মি-পাত!
দীপ্ত নীলাম্বরে আজি পূর্ণ মহিমায়
প্লাবিয়া নিখিল বিশ্ব কি আনন্দ ভায়!
সারা বর্ষ খেলিয়াছি স্বপনের খেলা ;
যারে চাহি তারে শুধু করি অবহেলা!

সংশয় করিতে দূর জালে পড়ি ধরা,
রুদ্ধ ঘরে ছিনু বসে অন্ধকারে ভরা।
দূর কর আজি প্রভু মায়া-কুহেলিকা!
জ্বালাও, জ্বালাও চিত্তে নব-দীপ-শিখা!
সব দ্বন্দ্ব ঘুচি পথ হউক্ সরল,
মুক্ত কর, এ কঠিন স্বার্থের শিকল!
নব প্রাণ সঞ্চারিত হোক ধরাতলে,
ঝরুক্ অমৃত-ধারা তব জলেস্থলে!

বর্ষার গান

বাজেরে বাজে হিয়ার মাঝে
বাদল-ঝরা গান ;
মেঘের সাথে মিলেছে রাতে
সকল মনপ্রাণ।
শ্রাবণ ঘন, নিবিড় নিশা,
না হেরি পথ, না পাই দিশা,
জানি না আজি উঠেছে বাজি
কাহার আহ্বান!
হৃদয়-তীরে ধ্বনিয়া ফিরে
বাদল-ঝরা গান।

আপন মনে নিভৃত কোণে
জ্বালায়েছিনু বাতি ;
সহসা কেন নীপের শাখে
উঠিল বায়ু মাতি!
তখনি দীপ নিবায়ে দিয়া,
পরশ কার লভিল হিয়া!
দেখিনু যারে, বরিনু তারে
চিরজনম সাথী ;
সহসা কেন পিয়াল বনে
পবন উঠে মাতি!
আমার গান আঁধার প্রাণে
দুয়ার খুঁজি ফিরে,
পথ না পেয়ে, নয়ন বেয়ে
ঝরিছে আঁখি নীরে!

কাজল-কালো বেদনা টুটে
খনে খনে সে চমকি উঠে,
অনল-ঝলা বিজুলি-ফলা
হৃদয় চিরে-চিরে।
আমার গান ফাটিয়া পড়ে
আকুল আঁখিনীরে!

কাহার তরে একেলা ঘরে
জাগিয়া রহে মন!
আকাশ পরে খুঁজিয়া মরে
কাহার দরশন!
পরান কার চরণ-পাতে
কাঁপিয়া উঠে গভীর রাতে?
কাহার ব্যথা বহিয়া আনে
বাদল-বরিষণ?
কাহার তরে একেলা ঘরে
জাগিয়া রহে মন?

শরৎ সভা

আজি এ প্রভাতে শরৎ সভায়
বিশ্বের ডাক পড়েছে,
তাই বুঝি নিরালায় বসি এই
সোনার মুকুট গড়েছে।
তারি আভা মোর নয়নের পরে
ধারাসম আজ পড়িতেছে ঝরে ;
সে পরশমণি ধরণীর বুকে
সকলি যে সোনা করেছে।
শুনিতেছি তাই শরৎ-সভায়
বিশ্বের ডাক পড়েছে।

দিকে দিকে তাই পুবের বাতাস
বারতা বহিয়া ছুটেছে,
পথে যেতে সে যে শিউলি বনের
মর্মের কথা লুটেছে।

শতদলমধু-লুব্ধ ভ্রমর
গুঞ্জন-রত পেয়েছে খবর
অমল হৃদয় মেলেছে কমল
ঘুমঘোর তার টুটেছে।
তাহারি আভাস বহিয়া পুবের
বাতাস আজিকে ছুটেছে।

মীড়ে ধীরে কভু গমকে গভীরে
আকাশে বীণা বাজে গো,
তালে তালে তার নাচিছে বিশ্ব
আলোক ছায়ার সাজে গো।
শুনি তটিনীর মঞ্জীর রব
শ্যামল দু-কূল স্তব্ধ নীরব,
পুলকি উঠিছে পরান তাহার
নয়নে কি হাসি রাজে গো।
মীড়ে ধীরে কভু গমকে গভীরে
আকাশের বীণা বাজে গো।

এসেছে আজি এ শরৎ সভায়
সকল বিশ্ব এসেছে,
বন্যার স্রোতে অযুত তরণী
নব আনন্দে ভেসেছে।
আকাশ ধরায় আজি কানাকানি,
প্রাণে প্রাণে আজ হল জানাজানি,
তাই দোঁহে আজি এমন পূর্ণ
মিলনের হাসি হেসেছে।
শরৎ-সভায় এসেছে আজিকে
সকল বিশ্ব এসেছে।

অন্তরের ধন

ধরি ধরি করে, ছুটি আলেয়ার পানে,
যত যায় সরে, ততো নিকটে সে টানে!
হেলায় দুর্গম পথ হয়ে যাই পার,
ত্বরিতে তরিয়া দুস্তর পারাবার!

ছুটিয়া চলেছে, তার নাহি শ্রান্তিলেশ,
আলেয়ার পানে রাখি আঁখি অনিমেষ।
সকলি আঁধার, শুধু এই আলোটুকু
মুমূর্ষুর প্রাণসম করে ধুকু-ধুকু।
ঐটুকু আলো যদি কভু নিবে যায়,
গতি তার হয় স্তব্ধ, সকলি হারায়।
অনন্ত আলোকধারা অন্তরের মাঝে,
নিবাত নিষ্কম্প দীপ্ত সুচির বিরাজে,
ফিরে দ্যাখ্ ফিরে দ্যাখ্ তারি পানে মন,
সেই নিরন্তর চির জ্যোতি-প্রস্রবণ!

বাসনা

কণ্ঠ চাহে করিতে গান,
হৃদয় চাহে করিতে দান
কেবলি ভালোবাসা।
নয়ন ফিরে দরশ মাগি,
বাহু সে শুধু পরশ লাগি
রেখেছে চির আশা।

চিত্ত যাচে পিপাসাতুর,
পদ-পরশ-রস মধুর,
শুধু ক্ষণেক তরে,
পরান চাহে পাত্রে তার
ভরিতে যেই সুরভিসার
অঙ্গ হতে ঝরে।

একটি শুধু যামিনী তরে,
সকলি মোর কাঁদিয়া মরে
চাহিয়া পথ পানে,
তন্দ্রাহীন নীরবতায়
আঁধার নিশি ডুবাতে চায়
শুধু একটি গানে।

একটু প্রেম, একটি মালা,
একটু তার দহন-জ্বালা
গভীর বেদনায়।

একটু শুধু জোছনা-পাশ,
দখিন-বায়-দীর্ঘশ্বাস
চিত্তে আপনার!

এমনি প্রিয়া মধুর সাজে
নামিবে কবে এ হিয়া মাঝে,
চরণ ফেলি ধীরে।
অন্তহীন সে অভিসার
রচিবে কবে বিরাম তার
আমার এই তীরে!

গান

বেহাগ

প্রভু, মুছাও আঁখিবারি,
কৃপাভিখারি তব দ্বারে!
ফিরায়োনা, রেখোনা আর এ
অন্ধ কারাগারে!
আজি আলোক উৎসবে
একি অলোক সৌরভে
ভাসিল ধরা, তব বিমল
অমৃত রসধারে!

শ্যামল তৃণে পুষ্পবনে
ফুটিল একি হাসি!
গগন জ্যোতিমগন হল
তিমির ঘন নাশি!
এ অন্তরে শূন্য ঘরে,
নিরাশা কেন কাঁদিয়া মরে ;
আশার বাণী শুনাও, লহ
আঁধার পরপারে।

কবে

কবে সকল বাঁধন ছিঁড়ে তোমার
মুক্ত হাওয়ায় প্রাণ জুড়াব!

কবে সকল ধুলা ঝেড়ে তোমার
চরণধুলা মাথায় পাব!
কবে আমার হিয়ার মাঝখানেতে,
তোমার আসন রাখ্‌ব পেতে!
কবে সকল বোঝা নামিয়ে দিয়ে
পরম প্রেমে প্রাণ পুরাব!
কবে আমার মনের আঁধার কোণে
উঠ্‌বে জ্বলে তোমার বাতি!
কবে মহানন্দে ডুবিয়ে দেবে
আমার দিবস, আমার রাতি!
কবে জীবনতরী তোমার কূলে
লাগ্‌বে গিয়ে চরণমূলে,
কবে পারের হিসাব চুকিয়ে দিয়ে
হাটের খেয়ার কূল ভিড়াব?

গান

বেহাগ

জাগ জাগরে, হের অন্তরে
হৃদিগগন মাঝে!
জাগ্রত অনন্ত প্রেম
চন্দ্রমা বিরাজে!
লহরে চিত ভরিয়া
পড়ে অমৃত ঝরিয়া ;
সকল ভুলি দুয়ার খুলি
এসো মধুর সাজে!

ফুটিল একি মাধুরী
নিখিল রস-সরসে
চিত-মধুপ সুধা-লোলুপ
গুঞ্জরিল হরষে!
কাহার বীণাযন্ত্র
বাজায় প্রেমমন্ত্র,
অসীম নভ পূর্ণ করি
বাজে নীরবে বাজে।

বেদনা

ব্যথা জাগে অন্তরে,
কোন আলোকের পরশ মাগি
অন্ধ হৃদয় কন্দরে।
কোন প্রভাতের অরুণ হাসি
নয়নে মোর উঠ্‌বে ভাসি,
মিলিয়ে দিয়ে আঁধার রাশি
ঘুচাবে সব দ্বন্দ্ব রে।

কোন প্রেমে আজ সাজ্‌ব গো!
কি চন্দনের গন্ধভরে
অঙ্গ আমার মাজ্‌ব গো!
মোর তরী কোন স্রোতের টানে
ভেসে যাবে অকূল পানে ;
কোন বাতাসে বাজ্‌বে গানে
চিত্তবাঁশির রন্ধ্রে রে!

অপরিচিত

কোন সাগরের জোয়ার আসে
কে জানে, কে জানে!
ভাস্‌ল তরী দূর আকাশে
কার পানে, কার পানে!
বাদল ধারা কার সে প্রেমে,
কি গান গেয়ে আসে নেমে!
ফলে-ফুলে হাসে ধরা
কার দানে, কার দানে।

কোন সুদূরে কোথায় সে তীর,
কোন খানে, কোন খানে?
মোর বাণী আজ সজল সমীর
কয় কানে, কয় কানে।
মোর নয়নের পলক ছেয়ে
অশ্রুধারা পড়ে বেয়ে,
কাহার বীণা বাজ্‌ল হোথা
কোন তানে, কোন তানে?

নিরাশের আশা

একটি গানে কইব প্রাণের কথা,
পারি না গো, তাও যে পারি না!
একটি সুরে বাজ্‌বে মনের ব্যথা,
পারি না গো, তাও যে পারি না।
একটি প্রাতে নবীন কুসুম তুলে
দিব ঢেলে ঐ চরণের মূলে
হৃদয়দলের সবগুলি দল খুলে,
পারি না গো, তাও যে পারি না।

এমন আশা কে জাগাল মনে,
হারি না গো, তবুও হারি না।
নামে আঁধার কোন অশুভক্ষণে,
হারি না গো, তবুও হারি না।
তবু বীণায় বাঁধতে যে চাই সুর,
জাগে পরান বিরহ বিধুর,
আভাস পেয়ে ধায় হৃদয় সুদূর,
হারি না যে তবুও হারি না।

সঙ্কোচ

টোড়ি—ঝাঁপতাল

যদি এ মনে সঙ্গোপনে
শুনাও তব বাণী,
তবুও ঐ পুণ্য নাম
কেমনে মুখে আনি।
আসিবে যদি চরণ ফেলে
সকল বাধা দু-হাতে ঠেলে,
কেমনে প্রভু চরণ তবু হৃদয়ে লব টানি।
তোমার ঐ পুণ্য নাম কেমনে মুখে আনি।

কেবলি ভয়ে নিজেরে স্মরি,
দূরেতে সরে যাই ;
নিয়ত মোরে অভয় দিতে
নিকটে এসো তাই।

যতই বলি নাহি যে কেহ,
তত্তোই তব বাড়ে যে স্নেহ ;
তোমারে যেই জানে না, তারে আপনি লহ জানি!
তোমার ঐ পুণ্য নাম কেমনে মুখে আনি!

পরিপূর্ণতার রূপ

সারাটি রজনী মোর নিদ্রা নাহি ছিল দু-নয়নে,
সুদূর প্রান্তর ব্যাপি, আমার এ নিভৃত শয়নে
পশেছিল জোছনার স্নিগ্ধ মৃদু পরশ কোমল,
হৃদিসরোবর মাঝে তারি প্রতিবিম্ব নিরমল
জাগায়ে তুলিল তাহে অপরূপ মুরতি মধুর!
ছিন্নতন্ত্রী বীণা মোর আজি কেন বিরহবিধুর
নিমেষে উঠিল বাজি! কতবার এসেছিল দ্বারে,
যুগযুগান্তের কথা এনেছিল বহি ভারে ভারে ;
কত সুখস্মৃতি তার, কত আশা কত জাগরণ ;
চাহিনি তো ফিরে আমি, করি নাই তাহারে বরণ,
কহি নাই কোন কথা! সহসা কি পরিচয়ে আজি
মুখর এ হৃদি-তন্ত্রী শত রাগিণীতে উঠে বাজি?
সমুখে রয়েছে পড়ি শ্যামকান্ত ফল-পুষ্পে ভরা
চন্দ্রকিরণ-রসবিহ্বল মুরছিত ধরা!
আমি তো একেলা নহি! এরও আজ ব্যথা বাজে বুকে
আজিকে সবার সাথে পরিচয় সব দুঃখেসুখে!
চিত্ত মোর কাঁদি কহে—এ রজনী আজিকে সফল!
চির-পরিপূর্ণতার হের এই রূপ সুবিমল!

আশা

কোথা জ্বালা জুড়াবার ঠাঁই! কোথা অতল সলিল!
কোথা সেই চির-প্রেম-রস-ধারা পূত, অনাবিল!
বেলা যায়, বেলা যায়, এ গাগরি ভরিল না আজ!
দিনান্তে বসিয়া ভাবি, হল না যে দিবসের কাজ!
কলহাস্য-মুখরিত গ্রামপথে যাত্রী চলে যায়,
সে রব শ্রবণে পশি চিত্তমাঝে করে হায় হায়!

অশ্রু-ঘেরা নয়নের একপ্রান্তে ফোটে তবু হাসি,
যাওয়া নাহি হল, তবু চিত্ত বলে 'যেতে ভালোবাসি'।
আজিকার এ যামিনী সফল করিনু দীপ জ্বালি,
কাল দিবসের শেষে এ গাগরী নাহি রবে খালি ;
কানায়-কানায় ভরি উছলি পড়িবে রসধার।
ছাড়িতে চাহে না মন এইটুকু গর্ব আপনার।
আজিকে এ অলঙ্কারে, এ বসনে ঢাকি দৈন্য লাজ,
আছি আশা ধরে কবে আসিবেন সে রাজাধিরাজ!

হৃদয়-স্বামী

ভিখারি কহে তোমারি দ্বারে
এসেছি কতদিন,
গেয়েছি কত দুখের গান
তবুও উদাসীন?
ধনী সে বলে কত না ধন
রেখেছি তোমা লাগি
সঁপিব বলে দিবসনিশি
রয়েছি আমি জাগি।
জ্ঞানী সে বলে খুঁজিয়া সারা
দেখা যে নাহি পাই ;
যতই বলি হয়েছে শেষ—
অন্ত দেখি নাই!
ক্ষ্যাপা সে বলে আপনা-হারা
ঘুরিয়া পথে-পথে,
কাঁদিয়া মরি, নিদয় তবু
আসে না কোনমতে!
বধূ সে বলে, হে প্রিয়তম!
কেবলি আঁখিজলে
সিক্ত করি নীরবে আজ
গেঁথেছি ফুলদলে।
বাসর-নিশি পোহায়ে যায়,
আসিবে কবে নাথ!
গোপনে মনে কে বলে তারে—
'রয়েছি তব সাথ।'

সন্ধান

কেঁদে কেঁদে ফিরে গহনে গহনে প্রাণ,
খুঁজে হয় সারা, নাহি পায় সন্ধান।
উষার উদয়ে, নিশার তিমির তলে,
সুখের পুলকে, দুখের নয়ন জলে,
বনমর্মরে, নির্ঝর কলকলে
ধ্বনিত বিপুল তান,
তারি মাঝে শুধু ব্যাকুল পরান মোর
খুঁজে হয় সারা, নাহি পায় সন্ধান।

কার লাগি এই বিশ্ব-সভার দ্বারে
জনম মরণ আসে যায় বারে-বারে?
কত খেলা হল কত না পথের শেষে,
কত কাল ধরে ভ্রমিল কত না দেশে,
কখনো সেজেছে দীন দরিদ্র বেশে,
কখনো রতনহারে।
আলোকে আঁধারে ঘুরিতে ঘুরিতে শুধু
জনম মরণ আসে যায় বারে-বারে।

আপনারে খুঁজে কে আপনি দিশাহারা,
দূরে চলে যায়, চোখে বহে জলধারা।
জানে না জানে না নিখিল ভুবন মাঝে
তারি আপনার পরম আপন রাজে,
বিশ্ববীণায় তাহারি বিরহ বাজে,
বিপুল গানের ধারা!
সকল দৃশ্যে, সব সংগীত তালে
আপনারে খুঁজে কে হল রে আজ সারা!

নেহদং যদিদমুপাসতে

আঁখির দুয়ারে আলো আসি বলে
মোরে বরে লও, বরে লও,
অন্তর মোর তারে দেখি বলে
ওগো তুমি নও, তুমি নও!

হৃদয়-কবাট খুলে বায়ু বলে
মোরে স্থান দাও, স্থান দাও,
মন বলে 'দূত, প্রভুর আদেশ
শুধু বলে যাও, বলে যাও।'
সলিল বলিছে 'শীতল বক্ষে
এসো ডুব দাও, ডুব দাও।'
চিত্ত কহিছে—রসের আধার
সে যে, তারে চাও, তারে চাও!
নীলিমা বলিছে গগন ছাইয়া
নেহারো রূপ অপার!
মনে বাজে বেণু অরূপের রূপ
সকল রূপের সার!
এমনি সকলে আসে যায় নিতি
বলে 'বরে' লও, 'বরে' লও।
কারে চাহে মন নাহি জানে, বলে
—ওগো তুমি নও, তুমি নও।

স্বপ্রকাশ

আপন বসন্তরাগে যেথা তুমি পূর্ণপ্রস্ফুটিত,
সেথা নাহি দখিন পবন!
নিঃশব্দ বীণায় তব যেথা জাগে সমাপ্ত সংগীত,
সেথা নাহি কাকলি কূজন!
অনন্ত মিলন সেথা, চির ভালোবাসা,
যেথা স্তব্ধ গুঞ্জরন, নাহি যাওয়া আসা,
বিরহ দহন নাহি, নাহি লুব্ধ আশা,
নাহি স্বপ্ন, শুধু জাগরণ!

যেথা তব তন্দ্রাহীন আঁখি জাগে দিনরাত্রি পারে,
সেথা নাহি ক্ষণ-চন্দ্রলেখা!
যেথা পদপ্রান্তে তব চির-মেঘমুক্ত রক্ত-রাগ,
সেথা নাহি উষারুণরেখা।
নাহি দীপ্তি ক্ষণিকের, নাহি অন্ধকার,
চির তৃপ্তি, নাহি অতৃপ্তির হাহাকার।
আছে মুক্তি, নাহি সেথা বন্ধন-বিকার;
নাহি সঙ্গী, নই সেথা একা!

চির পরিচিত

বঁধু

তোমার সাথে দেখা আমার
গ্রামের পথে যেতে,
শিউলি বনের গন্ধে যেথায়
পবন উঠে মেতে!
কচি ঘাসের বুকের 'পরে
যেথায় শিশির-অশ্রু ঝরে,
সোনার ধানের শীর্ষ যেথায়
দুল্‌চে ভরা ক্ষেতে ;
তোমার সাথে দেখা আমার
সেথায় পথে যেতে!

বঁধু

সকালবেলা সেথায় কত
খেলা তোমার সনে,
আলোর লুকোচুরি যেথা
আমলকীর বনে!
বাতাস যেথা পাতার 'পরে
নৃত্যঘোরে লুটিয়ে পড়ে,
ফুলের মধু ভ্রমর যেথা
লুঠ করে গোপনে ;
সকালবেলা সেথায় কত
খেলা তোমার সনে!

বঁধু

দিনের হাটে তোমায় আমায়
কতই বেচাকেনা!
শোধ হল না এক কড়িও
রইল কেবল দেনা!
হবে না শোধ, হবে না যে
সেই বেদনা প্রাণে বাজে
চিরদিনের ঋণী বলে
রইনু তোমার চেনা!
দিনের হাটে তোমায় আমায়
কতই বেচাকেনা!

বঁধু
গোধূলির ঐ ধূসর ছবি
আঁকা যখন হবে,
সন্ধ্যাবেলা পারে যাবার
সময় আসে যবে!
শেষ হবে সব বিকিকিনি
ঋণের পরে হব ঋণী
খেয়ার কড়ি আপনি দিয়ে
নায়ে তুলে লবে!
সন্ধ্যাবেলা পারে যাবার
সময় যখন হবে!

কে জাগে!

মেলিয়াছে আঁখি প্রভাতের পাখি
গাহে বন্দনা গান!
পুষ্পিত শাখা উষারুণ মাখা
বিরচে অর্ঘ্যদান!
করুণ-ললিত রাগে
স্বর্ণ-বলয়-শিঞ্জিত-বাহু
কে জাগে! কে জাগে!

আলোক ধারায় আজি কে দাঁড়ায়
আঁধারের পরপারে!
শুভ-পরশন রস-বরষণ
বিশ্বের দ্বারে দ্বারে!
হের ভৈরবী রাগে
শুভ-সিন্দূর-শোভিত ললাটে
কে জাগে! কে জাগে!

সুনীল বিথার অঞ্চল কার
অসীম শূন্যে লুটিয়া
চরণপ্রান্তে আছে একান্তে
রক্ত কমল ফুটিয়া।

বিমল প্রভাতী রাগে
বিশ্বকমল করি টলমল
কে জাগে! কে জাগে!
মুক্তবন্ধ চেতনছন্দ
ভাসিছে মন্দ পবনে!
ঘুচায়ে দ্বন্দ্ব জাগে আনন্দ
বিশ্ব ভবনে ভবনে!
হের ভৈরব রাগে
আলোক আঁধার করি একাকার
কে জাগে! কে জাগে!

সান্ত্বনা

মোর মনপাখি গাহে থাকি থাকি
হল না, হল না, হল না!
ওগো বিহঙ্গ! মেলো মেলো আঁখি,
ও কথা বোলো না, বোলো না!
আকাশে চাহিয়া খুঁজিতেছ কারে,
যারে চাও সে যে পিঞ্জরদ্বারে,
এই গান গেয়ে ডেকে বল তারে
খোল খোল দ্বার খোল না!
ওগো বিহঙ্গ! মেলো মেলো আঁখি,
ও কথা বোলো না, বোলো না!

চিত্তবাঁশরি কাঁদিছে ফুকারি,
বাজে না, বাজে না, বাজে না।
আজি হের দ্বারে অতিথি ভিখারি,
কান্না সাজে না, সাজে না!
শুনাও তাহারে দুটি সাধা গান,
যা আছে গোপনে, তারে কর দান,
তারপর হয় হোক্ অবসান,
তাতে যেন মন লাজে না!
আজি হের দ্বারে অতিথি ভিখারি,
কান্না সাজে না, সাজে না!

প্রাণবঁধু হায় এসে চলে যায়
রয় না, রয় না, রয় না!
মিছে হায় হায়, ফাগুনের বায়
সদাই বয় না, বয় না!
এসেছে যে আজ তারে যেতে দাও,
নূতন সুরেতে বাঁশি পুরে নাও,
যা করেছ দান, ভরে আছে তাও
অন্তরে সে তো ক্ষয় না!
মিছে হায় হায়, ফাগুনের বায়
সদাই বয় না, বয় না!

চিত্তকমল আঁখি ছল-ছল
ফোটে না, ফোটে না, ফোটে না!
চিরদিন অলি মধুকুতূহলী
জোটে না, জোটে না, জোটে না।
আসে মধুমাস শুভ অবসর,
ফুলে পল্লবে মেলি অন্তর
যে বারতা বহি আনে পিকবর
চিরদিন তাহা রটে না।
চিরদিন অলি মধুকুতূহলী
জোটেনা, জোটেনা, জোটেনা!

জ্যোৎস্না

নির্বাক অন্তর মোর উঠিছে শিহরি ;
স্থির মুগ্ধ দু-নয়নে অশ্রু পড়ে ঝরি।
এ যে সুধাগরলের অপূর্ব মিলন!
একি এ তাণ্ডব নৃত্য, একি অলোড়ন!
বিশ্বসিন্ধু বিমন্থিত উগারে গরল
ধরণীর দুঃখসুখ ; শুধু অচঞ্চল
জাগ্রত রয়েছে হের সুধাপাত্র হাতে!
কোন শুভ্র দেবীমূর্তি স্নিগ্ধ মহিমাতে।
ঝরিতেছে ধারাসম জোছনা নির্ঝর,
ব্যথিত এ বক্ষ মোর পুলক-জর্জর!

এমনি জননি, হও অন্তরে উদয়
পরিপূর্ণ সুধারসে সব হোক্ লয়!
লভি নিত্য চিত্তে তব অমৃত আস্বাদ—
কর আশীর্বাদ এই, কর আশীর্বাদ!

প্রেমের ভাষা

ভালোবাসো জানি তাহা, প্রাণ চাহে বল—'আহা
প্রেয়সি তোমারে ভালোবাসি!'
এই কথা প্রাণ ভরে শুনিতে দিও গো মোরে,
এ পরান চির উপবাসী!
সার্থক সে মালা গাঁথা মিলনের সুরে বাঁধা
বাজে যবে সাহানার তান,
বরষা ঘনায়ে আসে বিরহী নয়নে ভাসে
মল্লার-সজল অভিমান!
করুণ পূরবী রাগে ব্যাকুল বেদনা জাগে
পরিপূর্ণ বিদায়ের সুরে,
পূর্ণিমার আঁখি পাতে যামিনী মিলনে মাতে
বেহাগে সে গীত উঠে পূরে!
নদী সে বহিয়া যায় মিলনের বাসনায়
অন্তরে ধ্বনিত সারিগান,
সাগরের বক্ষে গিয়া পরজে গরজে হিয়া
তরঙ্গিত গীত দিনমান।
পুষ্পের পরানমাঝে বাতাসের বাঁশি বাজে
যখন সুরভি করে দান,
বৃক্ষপল্লব ছাপি উঠিতেছে কাঁপি-কাঁপি
সুরে তার মর্মরিত প্রাণ।
তাই বলি—ওগো প্রিয় সাহানায় বেঁধে নিয়ো
আমাদের মিলনের বাঁশি ;
ভালোবাসো জানি তাহা, প্রাণ চাহে বল 'আহা
প্রেয়সি তোমারে ভালোবাসি।'

দুটি তার

বিশ্বযন্ত্রে একটি মন্ত্রে
বাঁধা আছে দু-টি তার,
বাজিতেছে তায় জীবনের সুর
মরণের ঝঙ্কার।
দুটিতে মিলিয়া বাজে এক গান
যুগে যুগে বাজে, নাহি অবসান
আদি ও অন্ত জুড়ি দিনমান
ধ্বনিত সে ওঙ্কার!
বাজিতেছে তায় জীবনের সুর
মরণের ঝঙ্কার।

জীবনের সুর ধেয়ে চলে যায়
মরণের ধায় পাছে,
মাঝে নাহি তার কোন ব্যবধান
একই টানে বাঁধা আছে।
দ্যুলোক ভূলোক গাহে সেই গীত
বিশ্বহৃদয়-নিঃস্যন্দিত
কত বিচিত্র সুর কম্পিত
একটি ছন্দে নাচে ;
মাঝে তার নাহি কোন ব্যবধান
একই টানে বাঁধা আছে।

বিশ্বযন্ত্রে একটি মন্ত্রে
বাজিতেছে দু-টি তার,
জীবন মৃত্যু—আদি ও অন্ত,
তোলে এক ঝঙ্কার।
বাজিছে চন্দ্রতপনতারায়
বাজিছে আঁধারে অলোকধারায়
মুক্তির মাঝে বাঁধন কারায়
ধ্বনিত সে ওঙ্কার!
জীবন মৃত্যু—আদি ও অন্ত
তোলে এক ঝঙ্কার!

মানসী

হে মানসী মনপুরে আছ সবটুকু জুড়ে
তবু নাহি হেরি রূপ তব,
বাহির হইতে ছানি আনিতেছ বক্ষে টানি
রূপ রস গন্ধ নব নব।

আপনি দাও না ধরা তবু এই বসুন্ধরা
চরণে লুটিয়া পড়ে আসি,
কি মোহের ইন্দ্রধনু রচিল অরূপ তনু
মুরছিত তাহে রূপরাশি!

শ্রাবণে আকুল ঝড়ে কুন্তল লুটায়ে পড়ে
চমকে চাহনি বিজলিতে ;
বরষার ধারে তার বিগলিত বেদনার
কি মুরতি নারি যে লখিতে।

শরতে সুনীল নভে শব্দহারা গীতরবে
জোছনার মূর্ছনা বাজে।
আলোতে ছায়াতে মেশা মদির স্বপ্নের নেশা
স্খলিত বিহ্বল তারি মাঝে।

বসন্তের আগমনে মঞ্জু গুঞ্জরিত বনে
কুসুমের পরাগ সৌরভে,
বকুলশাখার কোলে তোমার ঝুলন দোলে
পল্লবমর্মর কলরবে।

নিত্যনবীন রূপে এই মতো চুপে চুপে
ভরিয়া উঠিছ তুমি মনে,
বিচিত্র সে গীতধারা পদতলে পথহারা
বিজড়িত নূপুরনিক্কণে!

মোর অন্তঃপুরে হেরি হৃদয়গগন ঘেরি
তারার আরতিশিখা জ্বলে,
সব মধুগন্ধভার নিঙাড়ি ঢালিছ সার
আমার এ চিত্তশতদলে।

সবখানে বিশ্বমাঝে বাহিরাও কত সাজে
তবু নাহি হেরি তব রূপ,

কেবল রয়েছে জানি   ভরিয়া হৃদয়খানি
মানস-মুরতি অপরূপ।

সহজ শোভন

এই চামেলি ফুলের মতো
শুধু সৌরভে মাখা ফুটে থাকা হোক
মোর জীবনের ব্রত।
নাহিকো ভাবনা কেন ফুটে আছে
আপনি পূর্ণ আপনার কাছে
প্রভাতের পানে আঁখি মেলিয়াছে
জ্যোতিঃসুধা পানে রত।
যেন অমনি শুভ্রতায়
আজি অনাবৃত করি হৃদয় আমার
দলগুলি খুলে যায়।
সরল সহজে আলোকে বাতাসে
শ্যামল স্নেহের বক্ষের পাশে
সব বাঁধা টুটি আপনা প্রকাশে
সফল পূর্ণতায়।
যেন এমনি ধরণী পরে
ধীরে দিন অবসানে ক্ষীণ জীবনের
চ্যুতদলগুলি ঝরে!
যেন এ ক্ষণিক বাঁধনের ডোর
একে একে সব টুটে যায় মোর,
পরান অমৃতগন্ধবিভোর
মরণেরে লয় বরে।

প্রকৃতির রূপ

প্রথম তোমার কোলে এসেছিনু যবে
হে মাতঃ প্রকৃতি! অর্থহীন কলরবে
চেয়েছিনু মুখপানে কেন নাহি জানি
তুমিও শুনাতে মোরে অর্থহারা বাণী,

বিগলিত স্তন্যসুধা করাইতে পান
পরিপূর্ণ স্নেহের সে অযাচিত দান!
লভেছিনু ও অঞ্চলে একান্ত নির্ভর
ওই বক্ষ মাঝে চির অমৃত নির্ঝর!
যৌবনের দ্বারে আসি সহসা দাঁড়ালে,
পরিচিত স্নেহভরে দু-হাত বাড়ালে,
সেই মুখ, সেই হাসি আনিয়াছ সাথে
সেই অচঞ্চল দৃষ্টি তব আঁখিপাতে!
সেই তব অর্থশূন্য নিঃশব্দ সংগীত
তোমার বিপুল যন্ত্রে আজিও ধ্বনিত!

নিরঞ্জন

কেবলি তোমার রূপের ছটায় যদি
থাকিতে আমার সম্মুখে নিরবধি,
ভেবে মরিতাম কোথায় তোমারে রাখি!
তৃষিত পরান চাহিত না কিছু আর
মরিত সে মহা লজ্জায় আপনার
গোপনে আঁধারে রহিত সে মুখ ঢাকি।

কেবলি যদি সে তোমার অসীম শক্তি
জাগাত পরানে আমার সভয় ভক্তি,
তাহলে মোদের মিলন ঘটিত না যে।
রুদ্রদীপ্তি সাগরে হতেম হারা
স্তম্ভিত হিয়া পেত না কূলকিনারা,
আপন দৈন্যে ডুবিত অকূল মাঝে।

তোমার যন্ত্রে কাঁপায়ে তন্ত্রীরাজি
সরবে গভীর বাণী যদি উঠে বাজি
কে তবে তাহার মর্ম লইবে বুঝি?
তোমার বীণার গভীর বিশ্বপ্লাবী
সে নীরব বাণী খুলিয়া গোপন চাবি
অন্তর মাঝে লভিবারে মরে খুঁজি।

হে নিরঞ্জন, আপনা গোপন করি
দিতেছ সকলি, লভি তাই প্রাণ ভরি,

কেমনে দিতেছ, কি যে দাও নাহি জানি
হে শক্তিমান, আপন শক্তি হরি,
প্রেমময়, কি আনন্দ মুরতি ধরি
সবস হবষে ভরেছ ভুবনখানি।

শেষ রক্ষা

তোমার চিত্র আঁক্‌তে গিয়ে
রঙ্‌ মাখিয়ে নিই তুলি,
একটি রঙে ডুবিয়ে নিতে
বাবে-বারে যাই ভুলি।
শেষ হয়ে যায় আঁকা যখন
হয় না দেখি মন্‌মতো,
তবু আমি নিপুণ শিল্পী
তোমার কাছে অন্তত।
তোমার কাব্য পড়ে যখন
আপন মনে মিল গাঁথি,
তোমার ভাবে, তোমার ভাষায়
তোমার ছন্দে ইত্যাদি ;
একটা ছন্দে আট্‌কে পড়ি
লেখা যে শেষ হয় না তাই,
সেটা তুমিই সাঙ্গ কর
যশের ভাগটা আমিই পাই!
তোমার সুরে মিল করে সুর
গাইতে চাই যে একসাথে,
সবগুলো গান হয় যে শেখা
গোল বাধে ঐ একটাতে।
গাইনা তাইতো মনের দুখে
শুন্‌চি কেবল তোমার গান,
তোমার সভায় স্থান তবু পাই
এইটুকুই যা আমার মান।
সাজাই যখন গৃহ আমার
তোমায় আন্‌ব পণ করে,
পুলক আমার জেগে উঠে,
গভীর আশা অন্তরে।

তোমার আসন পাত্‌ব কোথায়
এত যে সাজসরঞ্জাম,
এতদিনেও হল না তাই
পূর্ণ আমার মনস্কাম।
প্রাণপণে তাই যা কর্‌তে যাই
একটু কেবল রয় বাকি,
তুমিই বল সেটা আমার
অক্ষমতা—নয় ফাঁকি!
সে আশ্বাসে ভরেছে মন
কিছুতে হার মান্‌বে না ;
কি সাধ আমার জান্‌ছ তুমি
আর তো কেহই জান্‌বে না।

ব্যর্থতার মান

তোমায় বলতে মনের কথা
রয়েছে মোর ব্যাকুলতা,
বলতে না দাও, থাক্ সে গোপনে।
বঞ্চিত এই প্রাণের মাঝে
জাগে গভীর বেদনা যে
তাই জাগিয়ে রেখো মনের কোণে।

এ সুর আমার নয়ননীরে
বাজ্‌তে চায় ঐ চরণ ঘিরে
বাজ্‌তে না দাও, থাক্ সে চরণতলে।
রেখো তারে নীরব করে
সেইখানে ঐ ধুলার পরে
ডুবিয়ে তারে দাও গো নয়নজলে।

ব্যর্থতারই আগুন জ্বেলে
দেব আমার সকল ঢেলে,
ভস্মশেষে তাই জ্বালিয়ে রেখো।
আশা আমার দগ্ধ করে
শূন্য করে, রিক্ত করে
লজ্জাহরণ চরণছায়ে ঢেকো।

সার্থক দান

এ সংসারে সবার সাথে অনেক কথা কই,
একটি কথা আছে তোমার তরে।
নয়নপাতে নীরবে কত অশ্রু-বোঝা বই
তোমার লাগি একটি ফোঁটা ঝরে।
কত না সুরে গাহি যে কত গান
কত বেদনা, কত যে অভিমান,
তাহার মাঝে একটি সুর ক্ষণে-ক্ষণে বাজে
সে সুর শুধু তোমায় খুঁজে মরে।

আশার কত কুসুম মনে ফুটায়ে তুলি নিতি
একটি আছে তোমার পদতলে।
কত বাসনাপ্রদীপে মোর উজলি উঠে প্রীতি
একটি দীপে আরতিশিখা জ্বলে।
কত না রসে হৃদয় উঠে ভরি
প্রকাশে রূপে নব মুরতি ধরি,
একটি রূপ রাঙিয়া রহে সে যে তোমার রঙে।
একটি মণি ললাটে শুধু ঝলে।

আঁধার পটে কত না তারা ফোটে নিবিড় রাতে
সেথায় একা তুমি জোছনাধারা,
আলো আঁধার মিলেছে যেথা উষার আঁখিপাতে
সেথায় তুমি জাগিছ শুকতারা।
কত ভাবনা নামে হৃদয়তীরে
একটি থাকে চরণ তব ঘিরে,
জাগরণে জাগিয়া ছোটে কর্মধারা কত
একটি হয়ে তোমাতে হয় হারা।

বিশ্বপ্রেম

তোমারে যেই রেখেছে দূরে
তাহারি দ্বারে
কত না রূপে এসেছ তুমি
ফিরেছ বারে-বারে।

তুমি তো পূজা চাহনি নাথ
সবার পানে বাড়ালে হাত
তাহারি মাঝে নিতেছ দান
লুকায়ে আপনারে।

কেবলি যদি তোমারে প্রভু
করি নমস্কার
লহ না তাহা, লহ না, মুখ
ফিরাও বারে বার।
সবার সেবা রয়েছে যেথা
রেখেছ তুমি চরণ সেথা
তাহারি মাঝে করি প্রণাম
নিভৃত দেবতারে।

সুরের মিল

কে গো বাজায় নীরব পরশে,
সে যে হৃদয়বীণায় বাজে!
তারে তারে সুর ওঠে যে নেচে
ছোটে রক্তধারার মাঝে।
বিশ্বহৃদয়-স্পন্দনেরি তালে
অম্বরে যেই মৃদঙ্গ বাজালে
তারই তালে বাজাই যন্ত্র মোর
বারে বারে দেখি মিল্‌ছে না যে।

কোন রাগিণী কখন কে বাজায়
শুধু যন্ত্রে বাজে সে কি
কেমন করে কোন দিকে সে ধায়
কোথা রূপটি তাহার দেখি!
সেই সুরেরই ছায়াটি গোপনে
ছুটে এসে আঘাত করে মনে,
এখন আমি গাইতে চাই যে গান
ছায়ার মতো আসে মিলে যায়।

কে বলে মন ভুলিয়ে রাখে গানে
সে যে গভীর বেদনা

সেই বেদনার কঠিন ঘায়ের তানে
কর যন্ত্র সাধনা।
অশ্রু-জলের জোয়ার বয়ে যাবে,
তারই মাঝে সুরটি খুঁজে পাবে,
তখনই ঠিক ছন্দে সুরে তালে
নাচ্‌বে গানের লহর আমার প্রাণে।

অতিথি

মিশ্র বাহার

এসেছে অতিথি, দ্বারে এসেছে
ফুলে পল্লবে বর্ণে সুগন্ধে
সে যে ভুবনভুলানো হাসি হেসেছে।
সে যে মৃদু গুঞ্জনগীত গাহিয়া
এল নবীন তরণীখানি বাহিয়া
রহে তৃষিত নয়ন মম চাহিয়া,
আজি ভেসেছে, নিখিল ধরা ভেসেছে
একি আনন্দ প্লাবনে ভেসেছে।

আজি সরস দখিন-বায় পুলকে
প্রাণতরঙ্গ-কম্পিত দ্যুলোকে
হের বাহিরিল চিত মম পলকে
ভালোবেসেছে, তাহারে ভালোবেসেছে
সেই ভুবনভুলানো হাসি হেসেছে।

অন্তরের উৎসব

পরজ

জাগিছ তুমি সুনীল নভে
জাগিছ এই প্রান্তরে
তেমনি পরিপূর্ণরূপে
জাগহে জাগ অন্তরে।

বাহিরে তব রসের লীলা
সে স্রোতধার পূতসলিলা
দিবসনিশি তাহারি মাঝে
চিত্ত যেন সন্তরে।

ধরণী শুচিবসন পরি
বাহিরিল এ উৎসবে
উতলা বায়ে বেজেছে বাঁশি
লুটিয়া ফুলসৌরভে।
তাহারি ছায়া হৃদয়বনে
বিছায়ে দাও অতি গোপনে,
কর মুখর বীণায় তার
তব পরশ মন্তরে।

ভক্ত

কীর্তন

কাঁদায়ে আর কেমনে তুমি
ফিরাবে তারে কোথা,
সকল সুখেদুঃখে সে যে
চরণে অবনতা!
টানিয়া কাছে আনিয়াছ যারে
এ ত্রিভুবন যে বাঁধা তার দ্বারে,
করেছে সে যে চরম আপনারে
নিখিল অনুগতা।

ভুলায়ে আর রাখিবে কত
অলঙ্কারে সাজে
আপনারে সে ভুলিবারে চাহে
সকল জনার মাঝে।
বিশ্বের মাঝে বিলাইয়া প্রাণ
খুঁজিয়ে মরে সে আপনার দান
তোমার মাঝে চরম অবসান
গভীর নীরবতা।

বিশ্বদেবতা

গৃহের প্রাচীর রচি তুলে ব্যবধান
বিপুল অসীম সাথে ; আমার এ প্রাণ
আপনার মাঝে তৃপ্তি চায় লভিবারে
বিরলে বিজনে রহি। সে বদ্ধ দুয়ারে
আসি ফিরে যায় কত তরঙ্গ আঘাত
কত দুঃখবেদনার কত অশ্রুপাত।
এ বিশ্বের দেবতারে নিজ সিংহাসনে
অচল অটল করি রাখিতে গোপনে
কত না প্রয়াস তার! জাগে কত আশা
বাসনা অনলে জ্বলে দুরন্ত পিপাসা।
তবু গৃহদেবতার অক্ষুব্ধ বিহার
নিখিল বিশ্বের মাঝে ; পরিপূর্ণতার
তিল বাধা নাহি, জাগে মুরতি অম্লান
বাহির অন্তর ঘেরি রাত্রিদিনমান।

সম্মিলন

যুগে যুগে আসে আর যায়,
মিলন, মিলন সে যে চায়,
আসে যায় আলোকে আঁধারে
মোর সুখে দুখে বেদনায়।

এসেছে সে মধুঋতু সাথে
স্মিতহাসি লয়ে আঁখিপাতে ;
নিখিল চিত্ত ঘেরি তাই
উতলা পবন আজি মাতে।

এসেছে হিয়ার কিনারায়,
নূপুর বেজেছে পায় পায়,
মধুর হিন্দোল রাগিণীর
মুরতি চিত্তমাঝে ভায়।

এমনি সে নামে কত সাজে
ভূলোক দ্যুলোকে হিয়ামাঝে।

কত ছন্দে, কত নব রাগে
বাজে, সুমধুর বীণা বাজে।

সে যে আসে মোর কাছে ধেয়ে
শুধু মোর মুখপানে চেয়ে ;
শূন্যে কোথা সুদূরে কে জানে
যায় মিলনের গীত গেয়ে।

পবনে সুরভিটুকু তার
খুঁজে ফিরে অঙ্গ আমার ;
তাহার বীণার তারে তারে
বাজিতেছে আমার ঝঙ্কার।

ঝরে পাতা, ফোটে কিশলয়
ফুটে আর টুটে কুবলয়,
এরি মাঝে তারই আসা-যাওয়া
নিত্য জাগরণ আর লয়।

আসে সে যে, যায় আর আসে,
চিরদিন মোরে ভালোবাসে,
সবে বাঁধি মহা সম্মিলনে
আসে মোর মিলনের আশে।

দুয়ারে

সিন্ধু

বধূ এসেছে প্রিয়তম
        খোল গো খোল দ্বার!
লজ্জা অবগুণ্ঠন
        ঘুচাও এইবার।

মেলিও আজি নয়ন
রচিও নব শয়ন
কুসুম করি চয়ন
        গাঁথিও ফুলহার।

নিভৃত বনমাঝে
তাহার বীণা বাজে
মৃদু পবনে রাজে
        সুরভি উপহার।

তুমিও সখি দিয়ো
সুধা বচন অমিয়
চিরজীবনপ্রিয়
        লভিও আপনার।

বঁধু

সে যে আসে   তার আশে
    ভালোবাসে প্রাণ যারে।
তারি লাগি   আছে জাগি
    অনুরাগী বঁধুয়ারে।
তারি তরে   নিশিভোরে
    প্রেমডোরে গাঁথে মালা
গাহে নিতি   মধুগীতি
    আনে প্রীতি ভারে-ভারে।

বঁধু মাতে   মধু রাতে
    তারি সাথে কি মিলনে ;
সে বিতানে   বাঁশি তানে
    কহে প্রাণে কি গোপনে।

হৃদিতলে   কালো জলে
    কত ছলে নামে ধীরে,
উতলা সে   কি উল্লাসে
    কলহাসে ঘিরে তারে।

নিবেদন

কীর্তন

ওগো ডাকার মতো হয় না যে ডাকা
কথার বোঝা শুধুই ওঠে বেড়ে
হয় না যে মন চরণতলে রাখা
আমার সকল মলিন ধুলা ঝেড়ে

তোমার রসে হয় না মাতোয়ারা
ব্যাকুল করে বয় না চোখে ধারা,
তোমার ডাকে দেয় না সে যে সাড়া
উঠছে না সে অলস শয়ন ছেড়ে।

ওগো পরানবঁধু আছ পরান মাঝে
একান্তে সেই হেরব তোমায় কবে,
বুকভরা সেই বোধটি জাগে না যে
কেমন করে শূন্য পূর্ণ হবে।

আনন্দহীন হৃদয়নিকেতনে
বাজে না যে বাঁশি প্রেম বিহনে,
জাগে না সেই দৃষ্টি দু-নয়নে
অবাধে যায় অরূপ মূর্তি হেরে।

সুদূর

সুদূরের পানে নয়ন মেলিয়া চাই
স্বপনের মতো কি রূপ নয়নে ভাসে!
কোন গীতরসে টুটিয়া বক্ষ তাই
কি যে বেদনার শতদল পরকাশে।
সকল ডুবায়ে জনম জনম গো
ভরিয়া আমার গোপন মরম গো,
সুদূরের ধন অন্তরতম গো
নিত্য নিত্য চিত্তে যেন বিলাসে।

সুদূরে কোথায় বেজেছে করুণ বাঁশি
হৃদয়যমুনা উজান বহিল তায়,

কূলে কূলে তার ভরি উঠে কলহাসি
মত্ত লহরী উছেল জোছনায়।
আমার পরম চিত্তহরণ গো!
আমার মোহন স্নিগ্ধবরন গো!
আমার জনম, আমার মরণ গো!
নিত্য জাগিছে সুদূরে চিত্ত আকাশে!

সকল-ভোলার দেশ

অতল সাগর মাঝে আছে
সকল-ভোলার দেশ,
আদি অন্ত নাহিকো
সেথায়, নাই বিধানের লেশ!
নানান্ দ্বারে দিচ্ছে হানা
অনেক শোনা, অনেক জানা
কত বারণ কতই মানা
নাহিকো তাহার শেষ।
তার মাঝেতেই আছে গো সেই
সকল-ভোলার দেশ।

নাইকো সেথায় রাত্রি-দিবা
নাইকো আঁধার-আলো
রূপ-অরূপের ভেদ কিছু নাই
নাইকো সাদা-কালো।
নানান্ দ্বারে আছে তাহার
রঙ্ বেরঙের কতই বাহার
কত চাওয়ার, কত পাওয়ার
কত মন্দ-ভালো ;
সে দেশটিতে কোথাও কিন্তু
নাইকো আঁধার-আলো।

হাসিকান্না সুখ ও দুঃখ
সেথায় একাকার,
আকার সেথা যায় না দেখা
নাইকো নিরাকার!

নানান্ দ্বারে আছে কত
বড় ছোটর আকার শত
কেউ-বা উঁচু, কেউ-বা নত
কেউ-বা নির্বিকার ;
সেথায় কিন্তু নাই ভেদাভেদ
সকল একাকার।

সকল যাত্রী চলেছে সেই
সকল-ভোলার দেশে,
কেউ গিয়েছে, কেউ থেমেছে
দ্বারের কাছে এসে।
সন্ধান যে পেয়েছে তার
ভাব বা অভাব নাই কিছু আর,
আনন্দে তার নিত্য বিহার!
নয়ন অনিমেষে
হেরে সকল-দেখার অতীত
সকল-ভোলার দেশে।

মজার কথা

এত বড় মজা ভাই
যারে পেয়েছি তারে চাই
দেখি না যাহা, বলি তা আছে
আছে যা, 'নাই, নাই'।
নিকটে যাহা রয়েছে জুড়ে,
তাহারি লাগি ভ্রমি সুদূরে,
যে গান কভু বাজে না সুরে
সে গানই শুধু গাই,
এ তো বড় মজা ভাই।

এ তো বড়ই মজা ভাই
আছে যা, তারে পাই ;
জানি যা আছে অতি গোপনে
দেখি তা সব ঠাঁই।

আমার বলে জেনেছি যাহা
শেষে যে দেখি সবার তাহা,
সবার যা তা আপনি পাওয়া,
দিই যা লভি তাই,
এ তো বড়ই মজা ভাই।

এ তো বড়ই মজা ভাই,
নিজেরে নিজে চাই,
সবারে টানি নিজের পানে
সবার পানে ধাই,
আপন কথা পরের কানে
শোনাতে মন ফোটে যে গানে
অজানা যেই তাহারে জানি,
জানি যা, জানি নাই ;
এ তো বড়ই মজা ভাই।

গুহাহিতম্

রূপ অরূপের মাঝখানেতে
কে বেঁধেছে বাসা,
সেই গভীরের অতল মাঝে
কাহার যাওয়া আসা!
সেথা নাইকো ঢেউয়ের মেলা,
নাইকো আলোছায়ার খেলা ;
তবু নাইকো সেথা আঁধার ঘেরা
শূন্যতলে ভাসা!

ও সেই রূপ অরূপের মাঝখানেতে
কে বেঁধেছে বাসা!
প্রবল বায়ের ঝঞ্ঝা যত
সেথায় এসে থামে,
দুইটি তীরের মনের কথা
সেই দিকেতেই নামে।

সেথায় সকল গীতি এসে
একটি পরম সুরে মেশে,

সেথা নিরাশ হৃদয় অশ্রু মোছে
থাকে না তার আশা!
ও সেই রূপ অরূপের মাঝখানেতে
কে বেঁধেছে বাসা!

বর্ষশেষ

বেহাগ-দাদরা

বরষে বরষে জীবন পরশে
হরষে বেদনায়।
নিখিল ভুবন নন্দিত তারি
সংগীতসুষমায়।
সুখে-দুখে সে যে চির প্রণম্য,
অসীম সে, তবু নহে অগম্য,
সে প্রেমমুরতি হের সুরম্য
সুন্দর জোছনায়।

বিশ্বভুবনে শুন মন্ত্রিত
তাঁর বন্দনা গান,
সারা বরষের সকল ক্লান্তি
কোথা লভে অবসান।
ঘেরিয়া অপার মহা জলধিরে
শত তরঙ্গ যায় আসে ফিরে,
স্থির ধ্রুবতারা জাগে সে তিমিরে,
গম্ভীর মহিমায়।

বিরহী

কত জন্মজন্মান্তর আছি ওই চরণের তলে ;
কত ব্যর্থ যামিনী যে গিয়েছে দরশকুতূহলে,
কত আশা জাগরণে, উদয়ের প্রথম সোপানে
শুনিতে সে পদধ্বনি। চাহিবারে ওই মুখ পানে

কতবার মেলেছিল সজল কাতর দু-নয়ান,
শূন্য মনে ফিরেছিল, পায় নাই তোমার সন্ধান।
হে চিরবাঞ্ছিত মোর, খেলা নাহি হল সমাপন
আজিও আমার ; নাথ! বিরহের নিশীথ যাপন
সঙ্গীহারা একাকিনী! শূন্যমাঝে হৃদয় আমার
আর্তকণ্ঠে যাচে শুধু একবিন্দু বারি করুণার
চাতকের মতো! শুধু চিরদিন জীবনের ফুল
ভাসিছে স্রোতের টানে, লভে নাই চরণের মূল!
কত না আবর্তমাঝে ঘুরে মরে, নাহি তার শেষ
অকূলের কূল কোথা ভেবে মরে, না পায় উদ্দেশ।

দরিদ্রের ধন

এ পাপের বোঝা, শত জনমের কলুষের কালী
নামিবে, ঘুচিবে কবে নাহি জানি! কবে দিবে জ্বালি
এ বিশ্বমন্দিরে মোর অতি মৃদু দীপশিখাখানি!
লজ্জা যদি দেয় মোরে, তবু তারে অতি ক্ষুদ্র মানি
এক প্রান্তে রেখো ফেলে! দেখা যদি নাহি পাই তবু
এই আলো বক্ষে লয়ে রব জাগি জন্ম-জন্ম প্রভু!
ঈষৎকম্পিত এক অতি ক্ষীণ অলোকের রেখা
তা-লয়ে ভ্রমিব পথে ; একটু আভাসে শুধু দেখা
যদি পাই, তাই ভালো! দীপ্তি আমি নাহি চাহি নাথ,
পরিপূর্ণ প্রাণ লয়ে করিতে চাহিগো প্রণিপাত
একান্ত ভকতিভরে। বিশ্ব যদি হয় গো বিমুখ,
বিশ্বদেবতার পানে নিত্য চাহি রহিবে উৎসুক
উন্মুখ এ দীপশিখা। কর জাগ্রত এ চেতনা
'হল না হল না কিছু' এ জানার গভীর বেদনা!

বরষা আবাহন

বনে বনান্তে দিকে দিগন্তে
এসো হে নিবিড় এসো হে!
হৃদয়-ভরানো জীবন-জুড়ানো
এসো সুগভীর এসো হে!
এসো পবিত্র, এসো নিরমল,
এসো তাপহর, এসো সুশীতল,
অশনিমন্দ্রে এসো মহাবল,
ঘোর গম্ভীর এসো হে।

তৃষিত শুষ্ক তপ্ত ধুলায়
পরান বরষি এসো হে!
বিদ্যুত-জ্বালা চকিতে জ্বালায়ে
ভীষণ হরষে এসো হে!
এসো ঝরঝর সজল ছন্দে,
এসো ধরণীর আর্দ্র গন্ধে,
এসো নবঘন—ঘন আনন্দে,
পুলক-অধীর এসো হে!

করুণকঠোর

প্রলয় মূর্তি ধরিয়া এসেছ দুয়ারে ;
রুদ্র, ভীষণ নমি বার-বার তোমারে।
ধূর্জটি, তব জটাজাল উড়ে গগনে,
মাতে উন্মাদ নৃত্য ঝঞ্ঝাপবনে,
ললাটনেত্র চমকে আঁধার ভেদিয়া ;
হে ঈশান, তব প্রলয়-বিষাণ ফুকারে!
রুদ্র, ভীষণ, নমি বার বার তোমারে।

হে নিঠুর, এলে করুণ মুরতি ধরিয়া,
সব তাপদাহ নিমেষে লইলে হরিয়া!
ঝরিছে তোমার বেদনা বরষাপ্লাবনে,
রুদ্ধ দুয়ারে করিছ আঘাত সঘনে ;
মধুরে ভীষণে মিলন নেহারি অপরূপ

প্রলয়, সৃজন, নাচিছে বিশ্বপাথারে :
রুদ্র, দয়াল, নমি বার বার তোমারে।

অম্বর ঘেরি ডম্বরু তব বাজে হে,
এসো হে ভিখারি, এসো মঙ্গল সাজে হে!
এমনি ধুলায় ধুসর করিয়া লহ গো,
আদেশ তোমার বজ্রের রবে কহ গো!
দগ্ধ করিয়া সকল অশিব সংশয়
রিক্ত করিয়া করহে পূর্ণ আমারে!
হে শিব, কঠোর নমি বার বার
তোমারে!

ব্যর্থতা

শুধু এই সব, এই সব?
আপনার কানে শুনিব কি বসে
আপনারি কলরব?
শুধু ভুলে থাকি আপনার সুখে
আপন বেদনা সহি সদা বুকে
শূন্য বাক্য কহি নিজ মুখে
পূর্ণতা অনুভব!
এই সব, এই সব?

শুধু এই খেলা খেলে সবে
আপনার পিছে ছুটি কি গো কভু
আপনারে ফিরে পাবে?
সকলের মাঝে প্রবেশের দ্বার
বন্ধ করিয়া ভাবে বার-বার
এই তো পূর্ণ হয়েছে আগার
সবই আছে, কিবা চাবে!
এই খেলা খেলে সবে?

শুধু কেবলি এ জটিলতা
পথে-পথে মোর বাঁধা আছে পায়
বলে মোরে যাবে কোথা!

যে মালা কণ্ঠে পরাইতে চায়
চোরা কাঁটা তার শুধু বিঁধে গায়,
কারে চাহি মন দু-হাত বাড়ায়
কি লাগি চঞ্চলতা!
কেবলি এ জটিলতা।

শুধু এই সব, এই সব?
সকল ডুবায়ে শুনিব বিশ্বে
আপন কণ্ঠরব?
আপনার সুখ, আপনার দুখ
সবা হতে মোরে করিবে বিমুখ?
হবে না চিত্তে কভু জাগরূক
বিপুল সে অনুভব?
এই সব, এই সব?

অচেনা

গানে দেব কোন সুর লয়
বাঁধব কেমন ছন্দে
ভরে দেব কোন দেবালয়
কোন কুসুমের গন্ধে।

একলা বসে সুখে দুখে
রইব চেয়ে কাহার মুখে ;
মাতিয়ে নেব শয়ন আমার
কোন পুলক আনন্দে!

কোন বেদনায় বাজবে আমার
হৃদয়-বীণার তন্ত্রী,
কোন পরশে বাজবে সে তার
কে হবে তার যন্ত্রী।

সাগর আমার কূলে কূলে
কোন জোয়ারে উঠবে দুলে ;
মরবে আমার নিশীথ রাত্রি
কোন সুধাময় চন্দ্রে।

শিল্পীর প্রতি

সুদূর বাঞ্ছিত ধন অন্তরে আপনি দেয় ধরা,
হৃদয়ের রক্তে তাই রাঙাইয়া রূপের পসরা
কারে দাও পূজাঞ্জলি? না জানি সে চেনা কি অচেনা-
তারি সাথে ভুবনের হাটে তব চলে বেচা-কেনা।
রূপের মাঝারে তুমি আনি দাও অরূপের মায়া,
ভাবের আনন্দ দিয়ে বিরচিলে অপরূপ কায়া।
বর্ণে বর্ণে ছন্দে ছন্দে যে সংগীত রূপে ওঠে ভরি
শ্রাবণ-প্লাবন সম সে রাগিণী বিশ্বে পড়ে ঝরি।
বিচিত্র ঋতুর রসে সিঞ্চিত সে অমৃত সরস—
তোমার এ চিত্রপটে কাঁপি উঠে তাহারি হরষ।
আঁখি দিয়ে কী হেরিবে?—মেলেছ ধ্যানের ত্রিনয়ন,
মূর্ত মাঝে অমূর্তের তাই তো লভিলে দরশন!
ব্যক্ত যা তা কণাটুকু, বিরাট সে রয়েছে গোপনে,
জাগার নয়ন মেলি শিল্পী তাই রচিলে স্বপন।

চাতক সম

চাতক সম হৃদয় মম পিয়াসী!
আজি কাজল মেঘের পানে
সজল দিঠি কাতরে হানে,
তাই এ সুধানির্ঝর ধারে
দাঁড়ালে দ্বারে কি আসি।
কেতকী-বন-কেশর বাসে
বায়ু বিভল
ঝরা যূথিকা আসন-রচা
কাননতল।

মনের তারে গুমরে সুর,
ছন্দতালে বাঁধা সুদূর,
আজি এ বীণা তারে যে বাজে
নবীন সাজে বিলাসি॥

কলিকা কহে

কালিকা কহে "মালিকা রচি
দুলিব কার বুকে?"
তরু সে কহে "ঘরের খেলা
গেল কি তবে চুকে?
মরুর বুক দীর্ণ করি
আলোক পানে জীবন ধরি
স্বপন মাঝে গোপন করি
নব আগন্তুকে,
কাটানু কত দিবসরাতি
কি আশা উন্মুখে—
গেল কি সবই চুকে?
আজিকে তব সুরভি বহে পবনে
অলি সে ফিরে গুঞ্জরিয়া শ্রবণে।
পুলক তারি ভুলালো সব?
যাচিছ প্রেম কী অভিনব।
পরানব্যথা আজিকে কব
তোমারে কোন্ মুখে!
গেছে কি সবই চুকে?"
মালিকা কহে "নবীন মালা
তোমারি রস-বরণ ঢালা
জুড়াবে তব বুকের জ্বালা
নব আশার সুখে;
যাবে না কিছু চুকে॥

বাদল রাতের

সখি, বাদল রাতের গোপন বেদনা
তব আঁখিতে জাগিল আভাসে।
শুনিতে আমার বিরহের গান
দাঁড়াইলে দ্বারে কী আশে।
আজি এ আঁধারে আঁখি-বিনিময়
হল তোমা সাথে, তারি বিস্ময়
শিহরি উঠিছে হৃদয়ে আমার
মগন ছিল যে নিরাশে।
বিরহের স্রোতে ভাসি কোথা হতে
আসিলে হৃদয়তীরে,
আমার গানের মূর্ছনা কাঁদে
তোমার চরণ ঘিরে।
যূথিবন হতে সৌরভ হরি
অঞ্চল তব দিনু আজ ভরি
শত বরষার পূজা-উপচার
ছিল নিবেদন-তিয়াষে॥

সোনার রথে

"সোনার রথে অমরা হতে
কে এল গো, কে এল।"
বনের বীণায় শ্যামল সুরে মৌনবাণী শিহরিল।
রাঙা হাসির অন্তরালে শিমুল কাঁদে
"দেখিনি হায়,"
পলাশ বলে "দিল না ধরা, মরি যে লাজে
বিফলতায়।"
কোকিল বলে 'কুহরি' সারা,
পথের না পাই কূলকিনারা
ভাগ্যে কি মোর এই ছিল।"
মন-বিহগ ঝাপটি পাখা
কহে 'এল গো ঐ এল,'
নয়ন তবু সুরের ঘোরে আভাস তার নাই পেল।

মর্মমাঝে রঙের মেলা
গোপনে খেলে সুরের খেলা,
পুলক তারি বুকের মাঝে
ছন্দে তালে হরষিল
হৃদয়বনে গন্ধ তারি দখিন বায়ে শিহরিল,
ঐ এল গো, ঐ এল॥"

দুটি কথা

দুটি কথা বলে যাও গোপনে
আমার নিশীথ স্বপনে।
কেহ নাহি কাছে
শুধু পিয়াসী হৃদয় তব মিলন যাচে,
আজি বিরহ-উদাস পবনে।
গান গাহি মনে মনে
অকারণে,
তোমা লাগি জাগি মম বিজন ভবনে।
তুমি শুধু ধীরে
চিরপরিচিত সম এসো মনোমন্দিরে,
আজি নব উৎসব লগনে।

দেওয়ার খেলা

দেওয়ার খেলা সাঙ্গ হল নাকি?
নেব কি তবে এবার মুঠি ভরি?
গোপন কোণে যা কিছু আছে বাকি
দানের ছলে নিয়োগো তাই হরি।
আলোর দান ভরিয়া বুকে
কুসুম চাহে কী হাসি মুখে।
ঋণের ভার চুকায় তার
সৌরভ বিতরি,
দানের ছলে লও যে তাহা হরি।

দেবার মোর না যদি থাকে
ভরিয়া দাও শূন্যতাকে,
তাহাই শেষে লইয়ো হেসে,
লজ্জা দূর করি—
দেওয়া-নেওয়ার খেলিব খেলা
দিবস-বিভাবরী॥

দেখা সে কি নয়নের

দেখা সে কি নয়নের দেখা?
চিত্তপটে ধীরে ধীরে ফোটে যেই রেখা
বাহিরে তাহারে টানি
শিল্পী সে আঁকে ছবিখানি।
বর্ণছন্দ অন্তরালে আছে যেই রহস্যের দ্বার
তাই যে হয়েছে পার
তার দেখা শুধু নয়নের দেখা নয়।
ভাবের ফল্গু বয়—
সে অতলে ডোবে যার মন,
সে যে অনুক্ষণ
আঁধারের বুকে হেরে অনির্বাণ আলো,
মরণের কালো
বহি আনে পরবার হতে নবজীবনের
জ্যোতির্ময় বাণী!
যত জানাজানি
তারে টেনে আনি
অজানার পারাবারে, নিমেষে সে সকলি হারায়
তাই ফিরে পায়
সব হারানোর মাঝে পাওয়া চিরন্তন।
রূপের বন্ধন
ছিন্ন করি অরূপের দেখে সে আভাস।
নানা বরনবিলাস
অন্তরের সুধারসে মিলি সুষমায় ওঠে ভরি
ধ্যানের নয়নে পড়ে ঝরি
সীমাহীন ব্যঞ্জনার রেখা—
তারে বলে দেখা।

আবাহন

সুদূর প্রতীচ্যে উচ্চে তুলিয়া শির
প্রচারিল নারী নব মুক্তির বাণী।
মোরা হেথা ছিনু পড়ি বন্ধনজর্জর
নেমে এল দেবতার বরাভয় পাণি।
আজি শুভ জাগরণ ক্ষণে
স্বাগত অতিথি বঙ্গের প্রাঙ্গণে।
হেথা জাতি বর্ণভেদ নাহি,
মিলনের মন্ত্র মোরা গাহি।
সবার সেবার লাগি মোরা উন্মুখ,
সবারে আপন করি দীনতা ঘুচুক।
নন্দিত হোক সব কর্ম,
প্রীতি ভরি দিক্ সব মর্ম,
কুটির হইতে মহা হর্ম্য,
মুখরিত হোক্ নব জীবনের গানে।
হে অতিথি, আমরা যতনে
বরিব তোমারে প্রীতিসম্ভাষণে
জ্বালি মঙ্গল-দীপ তম অবসানে।
হে নারী শুনাও তব মুক্তির বাণী
তোমরা এনেছ টানি বিশ্বের দেবতার শুভাশিস বরাভয় পাণি।

শিল্পী নন্দলাল বসুকে লিখিত পত্র

২৮ মাঘ ১৯২১ সাল

১

ভো ভো শিল্পীত্রয়
লেখনীর তীর জুড়ি কর-ধনুখান
ছাড়িল তিনেরে লখি শব্দভেদী বান।
সে বাণ বিঁধিল কারে পথ মাঝখানে?
কে সেজন নিল হরি, খোদা-তাল্লা জানে!
তিন তিন মহাবীর একা হেথা দীন,
তুলি-রঙে যারে টান, ছোটে "গয়া" "চীন"

শব্দেরে আটকি জব্দ কর রেখাটানে
এ ভোঁতা কলম তাই লাজে হার মানে।
কলাভবনের কালাবঁধু নন্দলাল
ভীলদের মধুবায়?—হায়রে কপাল!
ইন্দ্রপুরী আধা রচি শচীশূন্য সুব
খ্রি মাসেল্‌ধোঁয়া-স্বর্গে ভাববসে চুব!
হলধর অসিত সে বলরাম সম
—বয়সে কালার ছোট, উচ্চে দাদাত্তম—
উড়ায় বিরহ-তাপ হাসির দাপটে,
সে রসে বঞ্চিত—তবু চাণ্ডাল তো বটে!
অসহযোগিতা চিঁড়ে ভেজে না কথায়,
অসহ বিরহ-জ্বালা সহিয়া হোথায়
যোগীত্রয় গুহামাঝে করিতেছে বাস—
এরাই গাঁধীর চেলা, সাবাস্‌, সাবাস্‌!
বুরোক্রাসি দুড় খাসি করতে জবাই
ছেলে-বুড়া, বাবা-খুড়া লেগেছে সবাই!
কলিকাতা এল রাজা জারজের খুড়ো,
খেয়ে গেল ঝাঁটা, তাও একেবারে মুড়ো!
কেন মিছে আছ পড়ি ওহার গরজে?
মরতের জীব ফিরে এসো গো মরতে।

শিলং ৩১-৫-২৭

২

আদিপর্ব

মোর মানসের পটে ছবি আঁকি বটে,
সে যে স্বপনের সাথী ;
তব তুলির লিখন সে চিরন্তন
আমি খেলা-ঘর পাতি।
মোর গোপন বিহার সন্ধান তার
আমি ছাড়া কেবা জানে!
তুমি আলোকের কূলে তারে ধর তুলে
নিখিল বিশ্ব পানে।

অন্তপর্ব

মেঘলোকে পাঠাইনু মানসের দূত।
শ্যামল পরশে রসি সজল মরুৎ
প্রবাসবেদনা বহি যাবে খারসান
সমব্যথী তোমা কাছে। প্রাণ আনচান,
তহবিল শূন্য, মন উদাস বিভল,
কোথা সেই ধূধূ প্রান্তর সমতল!
ভূতভাবনের যত কিম্ভূতের দল
পাইনের ফাঁকে-ফাঁকে হাসে খল্‌খল্‌।
শিরোপরি প্রাবৃটের ঘন কোলাহল
পদতলে খাড়া পথ বিষম পিছল।
মন বলে—আর কেন, চল্‌ ঘরে চল্‌
শীতল হয়েছে ধরা, নেমেছে বাদল।

রমা-স্মরণে

নানা বর্ণে স্মৃতিরেখা বহু বর্ষ ধরি,
কর্ম-উৎসবে ভরা দিবাবিভাবরী
মর্মে মোর আঁকিয়াছে বিচিত্র লিখন।
এসেছিলে শিশু, লয়ে নবীন জীবন,
উৎসধারে গীতরস নিত্য করি পান
পেয়েছিলে যে আনন্দ, করেছ তা দান।
অন্তরে প্রেমের সুধা, কণ্ঠে গীতরস,
বহিয়া করুণালক্ষ্মী বরষ বরষ
প্রান্তরের নীলাকাশ করেছ মধুর,
সেথা রবে তব স্মৃতি চির-ভরপুর।
কর্ম অন্তে চিত্ত মোর লভিত আশ্রয়
নির্জন কুটিরে তব ; প্রীতিবিনিময়
শূন্য হৃদয় মম করিত ভরণ,
ব্যথিত হৃদয়ে বহি তাহারি স্মরণ।

১

বলা যদি নাহি হয় শেষ,
তাহে নাহি মোর দুখলেশ।
খেলেছি ধরার বুকে
এই স্মৃতি বহি সুখে,
ভাসাব তরণী, লখি সেই অজানার দেশ।
সুর যদি নাহি পাই খুঁজি,
আমার বেদনা লহ বুঝি।
নয়ন ভরিয়া দেখি
ভাবি যে মধুর এ কী,
এ আনন্দ সাথে লব তোমার সুরের রেশ।

II {মা মা । গা -রা গা I ন্‌ সা । রগা -মগা -রগা I রা -া । -া -া -া I
বলা য ০ দি না হি হ০ ০০ ০য় শে ০ ০ ০ ষ

I (রা গা । মা পা া I পধা -পা । মগা -রা গা I মা -া । -া -া -া)} I
তা হে না হি ০ মো র্‌ দু ০ খ লে ০ ০ ০ শ্‌

I {মা পা । না -া না I র্সা -া । র্সনা র্সা -া I র্সরা -র্সা । -ণধা -র্সণা -ধা I
খে লে ছি ০ ধ রা র্‌ বু০ কে ০ এ০ ই স্মৃ তি ০

I পা পণা । ধা -পা (-ধা)} I -া I ণা ধা । ণা -া ধা I ধর্সা ণা । -ধা পা -া I
ব হি সু খে ০ ০ ভা সা ব ০ ত র ণী ল খি ০

I পা -ধা । পা -মা গা I রা গা । মা -া -া II
সে ই অ ০ জা না র দে ০ শ্‌

[ধা -র্সা । র্সণা -ধা]
II {মা -পা । পা -া পা I পা ধা । পধা -ণা ণধা I পা -া । -া -া -া I
সু র্‌ য ০ দি না হি পা ই খুঁ জি ০ । ০ ০ ০

I (পা ধা । ণা র্সা । I র্সনা র্সা । নর্রা র্সা -া I ণা ণা । ধা ণা -া)} I
আ মা   র রে ০   দ না   ল হ ০   ল হ   বু ঝি ০

I {না না । না । না I র্সা র্সা । র্সনা র্সা -া I নর্রা র্সা । ণা -ধা পনা I
ন য়   ন ০ ভ   রি য়া   দে০ খি ০   ভা বি   বে ০ ম

I পা পরা । র্নসা র্না -না} I না না । না -র্সা র্সা I র্সর্না র্সা । ণধা পা -া I
ধু র   এ কী ০   এ আ   ন ০ ন্দ   সা থে   ল ব ০

I পা পধা । পা মা গা I রা গা । মা -া -া IIII
তো মা   র সু ০   রে র   বে ০ শ

২

ঘুচাও ঘুচাও তব ঘন আবরণ
করে নব মধুমাস ফুলসাজ বিতরণ।
মেল গো নয়ন।
শীত-পরশনে কেন
হানিছ বেদনা হেন,
হের সচকিত কুসুমের লাজ-শিহরণ।
মধুপ বিচরে তাই আজি দ্বিধাভরে,
ফুলের গোপন ব্যথা প্রাণে গুঞ্জরে।
ফুটেছিল যে মাধবী
মধু সুরভি-গরবী,
হের আনত নয়নে তার ধারা নির্ঝরণ।

II না র্সা -া । নর্সা -ণা । -ধা -পা I পা ধা ধর্জ্ঞা । র্রা -া । র্সা -া I
ঘু চা ০   ০ ০   ০ ও   ঘু চা ও   ত ০   ব ০

I পা পা -ধা । ধনা -া । না -া I নর্সা -া -া । -া -া । মা মা I
ঘ ন ০   আ ০   ব ০   র ০ ০   ০ ণ্   ক রে

I মা পা পা । পা -া । পা -া I পা -ণা ধা । পা -ধা । পা -া I
ন ব ম   ধু ০   মা স্   ফু ০ ল   সা ০   জ ০

I মা -গা পা । মা -া । জ্ঞা -রা I সা সা -রা । জ্ঞা -া । -রা সা I
হি ০ ত ব ০ ০ ণ্ মে ল ০ গো ০ ০ ০

I সা রা সপা । মা -া । -জ্ঞা রা I সা রা জ্ঞা । সা া । সা া II
মে ল ০ গো ০ ০ ০ মে ল গো ন ০ য়ন্ ০

। -া া II {সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা । র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞা র্সা I র্জ্ঞা া -র্সা । র্জ্ঞা া । -া -া I
০ ০ শী ত প ব ০ ন লে কে ০ ০ ন ০ ০ ০

I র্রা র্মা র্জ্ঞা । র্রা র্রা । সা ণা I র্সা -র্জ্ঞা -র্রা । সা া । (া জ্ঞা)} I র্সা সা I
হা নি ছ বে দ না ০ হে ০ ০ ন ০ ০ ০ হে ব

I ণা র্সা র্সা । র্সা -া । ণা ধা I ণা া ধা । পা া । া া I
স চ কি ত ০ কু সু মে ০ ০ র ০ ০ ০

I পা -ধা পা । মা -পা । ণা ধা I পা -া ণা । ণা ধা । ণা া I
লা ০ ভ শি ০ হ ০ র ০ ণ হে ০ র ০

I ধা র্সা ণা । ণা া । ণা ধা I পা -ণা -ধা । পা া । া -া I
স চ কি ত ০ কু সু মে ০ ০ র ০ ০ ০

I পা -ধা পা । মা -পা । ণা -ধা I পা -া -া । া -া । -া া I
লা ০ ভ শি ০ হ ০ র ০ ০ ০ ০ ০ ণ্

I সা সা -রা । জ্ঞা -া । -রা -সা I সা রা সপা । মা -া । -জ্ঞা -রা I
মে ল ০ গো ০ ০ ০ মে ল ০ গো ০ ০ ০

I সা রা জ্ঞা । সরা -া । সা -া II
মে লে গো ন ০ য়ন্ ০

। -া -া II {সা গা গা । গা গা । গা -া I পমা -া -া । মা -গা । পমা -া I
০ ০ ম ধু প বি চ রে ০ তা ০ ই আ ০ জি ০

I জ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞা -রা । জ্ঞা -া I জ্ঞা পা পা । মা -া । জ্ঞা -রা I
দ্বি ধা ০ ভ ০ রে ০ ফু লে র গো ০ প ন্

I সা -জ্ঞা রা । সা -া । রা -ণা I ন্ সা -রা । সা -মা । জ্ঞা -রা I
ব্য ০ ০ থা ০ ০ ০ প্রা ণে ০ গু ০ ঞ্জ ০

I সা -া -া । -া -া । -া -া} I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা । র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞা -র্রা I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ফু টে ছি ল ০ যে মা

I র্জ্ঞা -া -র্রা । র্জ্ঞা -া । -া -া I র্ঋা র্মা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -া । র্রা র্সা I
ধ ০ ০ বী ০ ০ ০ ম ধু সু র ০ ভি গ

I র্রা -া না । র্সা -া । র্সা র্সা I না র্রা র্সা । ণা ণা । ণা -ধা I
র ০ ০ বী ০ হে ব আ ন ত ন য় নে ০

I {পা -ণা -ধা । পা -া । -া -া I পা -ধা পা । মা -পা । ণা -ধা I
তা ০ ০ র ০ ০ ০ ধা ০ রা নি ০ ঝ ০

I পা -া -ণা । ণা -ধা । ণা -া I ধা র্সা ণা । ণা ণা । ণা -ধা)} I
র ০ ণ্ হে ০ ব ০ আ ন ত ন য় নে ০

I পা -া -া । -া -া । -া -া I সা সা -রা । জ্ঞা -া । -রা -সা I
র ০ ০ ০ ০ ০ ণ্ মে ল ০ গো ০ ০ ০

I সা রা -পা । মা -া । জ্ঞা -রা I সা রা জ্ঞা । রা -া । সা -া IIII
মে ল ০ গো ০ ০ ০ মে ল গো ন ০ য়ন্ ০

৩

তব উৎসব প্রাঙ্গণে আজি
এসো নামি ওগো সুন্দর!
তব উত্তরী-পরশে পবন
কর আজি সুধামন্থর।
শালমঞ্জরী গোপনে
হের ব্যথিত বিরহ যাপনে,
কোকিল কূজন ক্রন্দন ধ্বনি
ছাইল বন বনান্তর।
গগনে ইন্দু বন্ধু-দরশ তিয়াষে
বিনিদ্র কত যামিনী কাটাল কি আশে?
জোছনা সুরভি চন্দনরসে
বিহ্বল করে অন্তর।

চপল হাস্যচঞ্চল কর
প্রাঙ্গণ ওগো সুন্দর।
আম্রমঞ্জরী যেথা পড়ে ঝরি
সুরভিত পথে সঞ্চর।
মৃদুল মলয় বীজনে
মধু গুঞ্জন সৃজনে
নন্দিত কর কুঞ্জবীথিকা,
ব্যাকুল উদার প্রান্তর।

II {ধা ণা পা । মা মা মা I মা -পধা মপা । মা জ্ঞা জ্ঞা I মা মণা ধা । ণা ধা ণধা I
তব উ ৎ স ব প্রা ০ ঙ্গ ণে আ জি এ স না মি ও গো

I পা -র্সা না । র্নর্সা ণা -ধা} I ধা না না । র্সা র্সা র্সা I ণা র্নর্জ্ঞা র্না । র্সনা র্সা র্সা I
সু ০ ন্দ র ০ ০ তব অ ০ ঞ্চ ল প র শে প র ন

I ণা র্সা ণা । ধা পধা মা I পা র্সা না । র্নর্সা ণা ধা II
ক র আ জি সু ধা ম ০ ন্থ র ০ ০

I মা ধা ধা । -া ধা ণা I পা পণা ধা । া ধা না I না র্সা র্সা । না র্সা র্ধনা I
শ্যা ম ল ম ০ ঞ্জ রী গো প নে ০ হে র ব্যা থি ত বি র হ

I না র্সনা র্সা । া -া -া I র্সা র্মা র্মা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্বা -র্মা র্নর্জ্ঞা । র্না র্সা র্সা I
যা প নে ০ ০ ০ কো কি ল কূ জ ন ক্র ০ ন্দ ন ধ্ব নি

I না র্রা র্সা । ণা ধা পমা I পা -র্সা র্সনা । র্নর্সা -ণা -ধা II
ছা ই ল ব ন ব না ০ ন্ত র ০ ০

II সা মা মা । মা -া মা I মা -া মা । মা মা পা I গা মপা মা । -া া -া I
গ গ নে ই ০ ন্দু ব ০ ন্ধু দ র শ তি যা যে ০ ০ ০

I মা মা -পা । পা মা মা I মা ধা ধা । ণা ধা ণা I পা র্পণা ধা । -া -া -া I
বি নি ০ দ্র ক ত যা মি নী কা টা ল কি আ শে ০ ০ ০

I ণা র্রা র্সা । ণা ধা ণা I পা -মা ধা । পা মা পা I মজ্ঞা -া জ্ঞা । জ্ঞমা মা পা I
জো ছ না সু র ভি চ ০ ন্দ ন র সে বি ০ হ্ব ল ক রে

I রা -মা জ্ঞরা । সা -া -া I মা ধা ধা । ধা -া না I না -র্সা না । র্সাধা না I
অ ০ শ্রু র ০ ০ চ প ল হা ০ সা চ ০ ঞ্চ ল ক র

I না -র্সা র্সর্গা । র্সা ধা না I না র্সা না । র্সা -া -া I ণা র্রা র্সা । -া ণা ধা I
প্রা ০ ঙ্গ ণ ও গো সু ০ ন্দ র ০ ০ আ ম ম ০ ঞ্জ রী

I ধা ণা পা । মা মা পা I মা জ্ঞা মা । পা মধা পা I জ্ঞা -মা রা । সা -া -া I
যে থা প ড়ে ঝ রি সু ব ভি ত প থে স ০ ঞ্চ র ০ ০

I র্সা র্মা র্মা । র্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা । -া -া -া I র্মা র্পা র্মা । -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা I
মৃ দু ল ম ল য় বী জ নে ০ ০ ০ ম ধু গু ০ ঞ্জ ন

I র্সা না র্সা । -া -া -া I ণা -র্রা র্সা । র্সা না র্সা I ণা -র্সা ণা । ধা ণা ধা I
সৃ জ নে ০ ০ ০ ন ০ ন্দি ত ক র কু ০ ঞ্জ বী থি কা

I পা ধা পা । মা গা মা I পা -র্সা না । র্রর্সা -ণা -ধা II II
ব্যা কু ল উ দা ব প্রা ০ ন্ত র ০ ০

৪

যেয়োনা যেয়োনা ফিরে
ভিড়াও তরণী তব মানস তীরে।
তুমি যে এসেছ বারে বার
হৃদয়ে পাইনি সাড়া তার,
চরণ-নূপুর শুধু বেজেছে স্বপন ঘিরে।
নিভৃত বকুল শয়নে
নিবিড় মিলন হবে নয়নে নয়নে।
আসিবে বিদায় রজনী,
এ মালা শুকাবে যখনি,
তখন বিরহ ব্যথা জানাব নয়ন নীরে॥

সা রা II জ্ঞা -া -া -া । -া -রা সা রা I রপা -মা -া জ্ঞরা । সা -া -া -া I
যে ও না ০ ০ ০ ০ ০ যে ও না ০ ০ ফি রে ০ ০ ০

I মা ধা ধা ধা । ধা পধা পধা পধা I পা -া । । । মা গা মা পা I
ভি ড়া ও তে ব নী তে ০ রে ০ ০ ০ মা ন স ভী

I মা পা -জ্ঞা । । -া সা রা II
রে ০ ০ ০ ০ ০ যে ও

II পা পা পা ধা । না র্সা র্সর্বা না I র্সা । -া -া । । । । । I
তু মি যে এ সে ছ ন্দ রে বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ র

I {না র্সা র্বা র্বা । র্বা র্সর্বা র্বা র্বর্মা I র্জ্ঞা -া -া -া । (র্বা র্সা ণধা পা I
ছন্দ দ যে পা ই নি সা ড়া তা ০ ০ র তু মি যে এ

I ধা না র্সর্বা না । র্সা । । -া)} I -া । -া । I
সে ছ ন্দ রে বা ০ ০ র্ ০ ০ ০ ০

I র্বা র্সা র্সর্বা র্সা । ণা র্বা র্সণা -ধা I পা -ধা মা । । পা র্সা ণা ধা I
চ র ণ নূ পু রে শু ০ ধু ০ ০ ০ বে জে ছে র

I পা ধা মপা ধপা । মজ্ঞা -রা সা রা II
প ন ঘি ০০ রে ০ যে ও

II সা গা গা গা । গা গা গমা -গা I মা -া । । । । । । । I
নি ভৃ ত র কু ল শ য় নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা পা মা জ্ঞা । জ্ঞা রা মজ্ঞা -রা I সা -রা -ন্া -া । ন্া সা ন্সা-রজ্ঞা I
নি বি ড় মি ল ন হ ০ রে ০ ০ ০ ন য় নে ০০

I সরা রা সা -া । -া -া -া -া I {পা ধা মা পা । ধা -না র্সর্বা না I
ন য় নে ০ ০ ০ ০ ০ আ সি বে বি দা য় র জ

I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I র্সা র্জ্ঞা র্বা র্জ্ঞা । র্বা র্জ্ঞা র্সর্মা র্জ্ঞর্বা I
নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ মা লা শু কা রে য খ

I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া} I র্সা র্সা -র্বা র্সা । ণা ধা র্সণা -ধা
নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত খ ন্ বি' র হ ব্য ০

I পা -ধা -মা -া । পা র্সা ণা ধা I পা ধা মপা -ধপা । মজ্ঞা -রা সা রা IIII
থা ০ ০ ০ জা না র ন য় ন নী ০০ রে ০ যে ও

তোমার সূতায় গেঁথে লব আজি ভাবনা কুসুম মোর
পরিবে কি তব গলে যদি হল নিশি ভোর?
ধুলার বক্ষে ঝরিয়া বিলীন
যা কিছু আছিল শুষ্ক মলিন,
বিচ্ছেদভরে যা ছিল ছড়ায়ে এনেছি কুড়ায়ে
বাঁধিতে মিলন ডোর।
মালা পর গলে যদি হল চিরনিশি ভোর॥
সংশয় ঘেরা আঁধারের মাঝে ফুটি
শিথিলবাঁধন কাঁদিয়া পড়িছে লুটি।
আজি প্রভাতের আলোকের গানে
মিলন বাঁধনে বাঁধ এক তানে ;
বরণ মালা রচিনু সুমধুর, কর আজি দূর
জনমের দ্বিধা মোর,
মালা পর গলে যদি হল চিরনিশি ভোর॥

II মা ণদা -া । দা দা -া I পা দা দপা । মা মা পা I গা মা গা । ঋা সা ঋা I
তো মা র্ সূ তা য়্ গেঁ থে ল ব আ জি ভা ব না কু সু ম

I গা -মা -া । -া -া -া I মা মা মা । গা গা গা I মা ণদা -া । না র্সা -া I
মো র্ ০ ০ ০ ০ প রি বে কি ত ব গ লে ০ য দি ০

I পা পণা ণদা । দা পা -মগা II
হ ল নি শি ভো র্

II {দা দা -া । না -া র্সা I র্সর্ঋা র্ঋা র্সা । ণনা র্সা -া I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞ র্জ্ঞ । র্ঋা র্সা র্সা I
ধূ লা র্ ব ০ ক্ষে ঝ০ রি য়া বি লী ন্ যা০ কি ছু আ ছি ল

I না -র্সা না । দা পা -া} I র্জ্ঞ -া র্জ্ঞ । র্জ্ঞ র্রা র্জ্ঞ I র্মা র্জ্ঞ র্ঋা । র্সা র্ঋা র্সা I
শু ষ্ ক ম লি ন্ বি ০ চ্ছে দ ভ রে যা ছি ল ছ ড়া য়ে

I ণা র্সা ণা । দা ণা দা I পা দা পা । মা গা মা I পা -া -া । -া -া -া I
এ নে ছি কু ড়া য়ে বাঁ ধি তে মি ল ন ডো র্ ০ ০ ০ ০

I পর্সা র্সা র্সা । র্সা র্সর্ঋা র্সা I ণা র্সা ণা । দা পা দা I পা দা দর্সা । -ণা -দা -পা II
মা লা প র গ০ লে য দি হ ল চি র নি শি ভো০ ০ ০ র্

II {সা -ঋা ঋা । ঋা ঋা ঋা I সা ঋা ঋা । । ঋা সা I ন্‌ সা । । -া -া -া I
সং ০ শ য় ঘে র আঁ ধ রে র মা ঝে ফু টি ০ ০ ০ ০

I সা ঋা গা । মা মা -া I মা মা মা । গা মা পা I মা পা -া । -া -া ।} I
শি থি ল বাঁ ধ ন্‌ কাঁ দি যা প ড়ি ছে লু টি ০ ০ ০ ০

I {দা দা দা । না র্সা -া I র্ঋা র্ঋা সা । -া না র্সা I র্সা র্ঋা র্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা I
আ জি প্র ভা তে র্‌ আ লো কে র্‌ গা নে মি ল ন বাঁ ধ নে

I না র্সা না । -দা দা পা} I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্জ্ঞা র্ঋা I র্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা -া I
বাঁ ধ এ ক্‌ তা নে ব র ণ মা লা র চি নু সু ম ধু র্‌

I না র্সা র্ঋা । র্সা ণা দা I পা পণা দা । প মগা মা I পা -া । । । । -া I
ক র আ জি দূ র্‌ জ ন০ মে র দ্বি০ধা মো ০ ০ ০ ০ র্‌

I র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সঋা ণসা I ণা র্সা ণা । দা পা দা I পা দা ণর্সা । -ণা দা -পা IIII
মা লা প র গ০ লে য দি হ ল চি র নি শি ভো ০ ০ র্‌

৬

আজি আঁধার সাগর মগন আমার এ পরাণ,
দূর অতলের হারাবাণী-স্রোতে ডেকেছে বান্‌।
তারায় তারায় যে লিপিখানি
ধীরে ধীরে নভে মেলিলে আনি
তাহার মর্ম্ম নিল জানি
মোর গভীর এ সন্ধান।
তারার আলোকে গাঁথা ছন্দের হার
অলখ নৃত্যে মাতি তোলে ঝঙ্কার।
ভাবনা দুলায়ে মোর বেদনা ভুলায়ে
নৃত্যপরশ প্রাণে দিল যে বুলায়ে,
গভীর আনন্দে মলিন ধুলা এ
পুলক-কম্পমান।

সা সা II সা -পা পা -া । পা -ম্‌া ধপা ম্‌া I গা মা গা -া । গা -দা ধপা -ম্‌া I
আ জি আঁ ০ ধা র্‌ সা ০ গ০ র ম গ ন ০ আ ০ মা র্‌

I গা -মা -গা হ্মা । সা -া -া -া I সা -হ্মা হ্মা হ্মা । সা -া সা সনা্ I

এ ০ ০ প রা ০ ০ ণ্ দূ র্ অ ত লে র্ হা রা০

I সা -হ্মা হ্মা -া । সা -না্ সা -া I গা মা পা -না । দা -হ্মা গা হ্মা II

বা ০ শী ০ স্রো ০ তে ০ ডে কে ছে ০ বা ন্ আ জি

II {পা -া গা -া । পা -হ্মা দা -া I দা -র্সা র্সা র্সা । র্সা -না র্ঋর্সা -া I

তা ০ বা য়্ তা ০ রা য়্ যে ০ লি পি খা ০ নি০ ০

I -া -া র্সা র্সা । র্সা -র্ঋা হ্মা -া I -া -া র্সা র্সা । র্সনা র্সা র্ঋা -র্সা I

০ ০ ধী রে ধী ০ রে ০ ০ ০ ন ভে মে০ লি লে ০

I না -দা হ্মা -া । -া -া -া -া} I গা -পা গা -া । পা -হ্মা পা -া I

আ ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ তা ০ হা র্ ম র্ ম ০

I -া -া হ্মা পা । দা -পা হ্মা -া I গা -া গা হ্মা । পা হ্মা গা -মা I

০ ০ মি ল জা ০ মি ০ মো র্ গ ভী র এ স ন্

I গা -া -া -া । -া -া ঋা সা II

ধা ০ ০ ০ ০ ন্ আ জি

দ্রুত লয়

II {সা সরা -গা গা । গা গা গা রা I সা -রা গা রা । সা -া -া -া I

তা রা০ র্ আ লো কে গাঁ থা ছ ন্ দে র হা ০ ০ র্

I প পনা না ধা । -া ধা পা হ্মা I গা হ্মা পা -হ্মা । গা -া -া -া} I

অ ল০ খ ন্ ০ জ্যো মা তি জে লে ঝ ঙ্ কা ০ ০ র্

I {পা পা গা গা । পা পা ধা -পা I ধর্সা র্সা র্সা র্সা । র্ঋর্সা -া র্সা -া I

ভা ব না দু লা য়ে মো র্ বে০ দ না ভু লা০ ০ য়ে ০

I র্সা -া র্সা না । ধা ধা ধপা ধা I ধা না র্সা র্সনা । ধনা -ধা পা -া} I

নৃ ০ ত্য প র শ প্রা০ ণে দি ল যে বু লা০ ০ রে ০

I গা পা পা পহ্মা । পা -হ্মা পা -া I হ্মা পা দা পা । হ্মা গা গা হ্মা I

গ ভী র আ০ ন ন্ দে ০ ধ রা র ধু লা এ পু ল

I পা পা ক্ষা ক্ষা । গা ' ক্ষা সা II II
ক ক ম প মা ন আ জি

৭

আজি এ নিশীথে জাগে একাকী
মম বিজন সাথী।
সব বাণী আজি লুপ্ত আঁধারে,
স্থির দীপশিখা মোর বেদনারে
জ্বালায়ে ধরেছি হৃদয় দুয়ারে,
রেখেছি আসন পাতি।
এসো এসো এসো একাকী, মম বিজন সাথী।
বদ্ধ অশ্রু গুমরি হৃদয়তলে
বিকশিয়া উঠে রজনীগন্ধার দলে।
সে সুরে মিলিয়া তব বাণী
গোপনে হবে যে কানাকানি,
নীলকান্ত এ পাত্রখানি
ভরিবে তিমির রাতি।
এসো এসো এসো একাকী, মম বিজন সাথী।

II {সা -পা সা । সা -পা । দ্‌ ণা I সা মা । । মা । । । । I
আ ০ জি এ ০ নি ০ শী ০ ০ থে ০ ০ ০

I (মা -জ্ঞা মা । মা -জ্ঞা । জ্ঞ -। I জ্ঞ -মা দা । দা ণা । ণা দা I
জা ০ ০ গে ০ এ ০ কা ০ ০ কী ০ ম ম

I মজ্ঞা মা মা । মা -জ্ঞা । সা -া)} I জ্ঞ মা -া । দা -া । দা -ণা I
বি০ জ ন সা ০ থী ০ স ব ০ বা ০ ণী ০

I ণ -র্সা -া । র্সা -া । -া -া I ণা -া দা । মা -দা । দা -ণা I
আ ০ ০ জি ০ ০ ০ লু প্‌ ত আঁ ০ ধা ০

I ণা -া -া । -া -া । -া -া I ণা র্সা ণা । ণা -া । দা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ স্থি র দী প ০ শি ০

I মা -া -া । মা -া । -া -া I মা -জ্ঞা মা । জ্ঞা -া । সা -া I
খা ০ ০ মো ০ ০ র্ বে ০ দ না ০ রে ০

I ণ্‌ সা সা । ণ্‌ দ্‌ । দ্‌ ণ্‌ I সা মা মা । মা মা । মা -জ্ঞা I
জ্বা লা য়ে ধ রে ছি ০ হৃ দ য় দু য়া রে ০

I জ্ঞা মা মা । মা -া । মা মা I মা -া -া । মা -া । জ্ঞা -া I
রে খে ছি আ ০ স ন পা ০ ০ তি ০ ০ ০

I জ্ঞা -মা -দা । দা -া । -া -া I মা -দা -ণা । র্সা -া । -দা -ণা I
এ ০ ০ স ০ ০ ০ এ ০ ০ স ০ ০ ০

I র্সা -র্মা র্মা । র্জ্ঞা -া । র্সা -া I ণা -া -া । দা -া । মা -া I
এ ০ স এ ০ কা ০ কী ০ ০ ম ০ ম ০

I জ্ঞা মা মা । মা -জ্ঞা । জ্ঞা -সা II
বি জ ন সা ০ থী ০

II {সা -মা মা । মা -া । মা -া I মা মা মা । মা মা । মা -া I
রু ০ দ্ধ অ ০ শ্রু ০ গু ম রি হৃ দ য় ০

I মা -া -জ্ঞা । জ্ঞা -া । -া -া I জ্ঞা মা দা । দা -ণা । ণা দা I
ত ০ ০ লে ০ ০ ০ বি ক শি য়া ০ ও ঠে

I দা ণা দা । দা -মা । মা মা I মা -জ্ঞা -মা । জ্ঞা -া । -া -া} I
র জ নী গ ন্ ধ র দ ০ ০ লে ০ ০ ০

I জ্ঞা মা দা । দা ণা । ণা -র্সা I র্সা -া র্সা । র্সা -ণা । র্সা -া I
সে সু রে মি লি য়া ০ ত ০ ব বা ০ ণী ০

I ণা র্সা ণা । ণা -দা । মা দা I দা -ণা ণা । ণা -দা । দা -া I
গো প নে হ ০ বে যে কা ০ না কা ০ নি ০

I মা -জ্ঞা সা । সা ণ্‌ । দ্‌ ণ্‌ I সা -মা মা । মা -া । মা -া I
নী ০ ল কা ন্ ত এ পা ০ ত্র খা ০ নি ০

I সমা মা মা । মা মা । মা -া I মা -া জ্ঞা । -জ্ঞা -া । -া -া I
ভ০ রি বে তি মি র ০ রা ০ ০ তি ০ ০ ০

I জ্ঞা -মা -দা । দা -া । -া -া I মা -দা -ণা । র্সা -া । -দা -ণা I
এ ০ ০ স ০ ০ ০ এ ০ ০ স ০ ০ ০

I র্সা -র্মা র্মা । র্জ্ঞা -া । র্সা -া I ণা -া -া । দা -া । মা -া I
এ ০ স এ ০ কা ০ কী ০ ০ ম ০ ম ০

I জ্ঞা মা মা । মা -জ্ঞা । সা -া II II
বি জ ন স ০ খাঁ ০

৮

তারে কেমনে ধরিব হায়,
সে যে কাছে এলে দূরে সরে যায়।
পরানে ক্ষণে ক্ষণে পরশ বুলায়,
চকিতে মিলায়।
মোর আলোকে আঁধারে,
সে যে আসি বারে বারে
বিজলি-ঝলক সম রসস্রোতে ঢেউ উথলায়,
চকিতে মিলায়।
কি যে তার গোপন কথা,
নিভৃতে অজানা ক্ষণে শুনাইল তা।
তাহারি আকুল বাঁশি
কাঁদিছে হাওয়ায় ভাসি,
সে রাগিণী রহি রহি কাঁদে মোর নিভৃত কুলায়,
চকিতে মিলায়।

মা গা II {মা মণা দদা দা । পা -া গমা -পদা । মপা -া -া -া । -া -া (সা সা I
তা রে কেম০ নে ধ রি ০ ব০ ০০ হা০ ০ ০ ০ ০ য়্ সে যে

I সা ঋা গা মা । পা -দা দা -র্সা । দা র্ঋা র্সা ণা । দা -পা মা গা) I -া -া I
কা ছে এ লে দূ ০ রে ০ দূ রে স রে যা য়্ "অ রে" ০ ০

I না না র্সা -া । র্সর্ঋা -া র্সা -র্ঋা । ণনা -া র্সা -া । -া -া -া -া I
প রা নে ০ ক্ষ০ ০ ণে ০ ক্ষ ০ ণে ০ ০ ০ ০ ০

I পা দা ণা ণদা । পা -া -া দা । মা পা দা দপা । মা -গা মা গা II
পরশ বু লা ০ ০ য়্ চ কি তে মি লা য়্ "অ রে"

-া -া II মা -দা দা দা । না -া র্সা -া । র্ঋর্সা -না র্সা -া । -া -া -া -া I
০ ০ মো র্ আ লো কে ০ আঁ ০ ধা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I দা দা না র্সা । র্সা -র্জ্ঞা র্ঋর্ঋা -র্সা । র্সনা -া র্সা -া । দা -া -া -া I
সে যে আ সি বা ০ রে ০ বা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I দর্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞর্মা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা -া । র্সা -া া -া । ণা র্সা র্সর্ঋা র্ঋর্সা I
বি০ জ লি ঝ ল ক স ০ ম ০ ০ ০ ব স স্রো০ তে

I ণা র্সা র্সণা দা । পা -া -া -দা । মা পা দা দপা । মা -গা মা গা II
ঢে উ উ থ লা ০ ০ য়্ চ কি তে মি লা য়্ "অ রে"

-া -া II {সা ঋা গা -মা । মা -া মা মা । মগা -পা মমা -পা । -গা -া -া -া I
০ ০ কি যে তা র্ গো ০ প ন ক ০ থা ০ ০ ০ ০ ০

I মা গা ঋা সা । ঋা ঋা গা -া । গা -মপা গা মা । গা ঋা সা -া} I
নি ভৃ তে অ জা না ক্ষ ০ ণে ০০ শু না ই ল তা ০

I দা দা না র্সা । র্ঋা র্সা র্ঋর্সা -না । র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I
তা হা রি আ কু ল বাঁ০ ০ শি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I দা দা না র্সা । র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া । র্ঋা -া -া -র্জ্ঞর্ঋা । -র্সা -া -া -া I
কাঁ দি ছে হাও য়া য়্ ভা ০ সি ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০

I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা । র্রা র্মা র্মর্জ্ঞা -র্ঋা । র্সা -া -া -া । ণা র্সা র্ঋা -র্সা I
সে০ রা গি ণী র হি র ০ হি ০ ০ ০ বা জে মো র্

I ণা র্সা র্সণা দা । পা -া -া -দা । মা পা দা দপা । মা -গা মা গা II II
নি ভৃ ত কু লা ০ ০ য়্ চ কি তে মি লা য়্ "অ রে"

৯

বুঝেছি বুঝেছি তব বাণী,
ধরার গোপন কথা এনেছ টানি।
ছন্দে গেঁথেছ হার
মঞ্জরী-সম্ভার,
সুরভিত ভাষা তব ভুবন-ভুলানী।
এসেছি তোমার লীলাঘরে
মুকুলিত গীত মোর এনেছি থরে থরে।
এরি তালে ঝিরি ঝির্
শিরীষের মঞ্জীর
বাজায়ে দিয়েছ দোল হৃদয়-দুলানী।

বিলম্বিত লয়

II {র্সা না র্সা । -া -া -া I ণা ধা ণা । -া -া -া I
বু ঝে ছি ০ ০ ০ বু ঝে ছি ০ ০ ০

I ধা পা মা । -ধা পা -া I {মা গা -া । রা পা মা I
ত ব বা ০ ণী ০ ধ রা র্ গো প ন

I গা রসা -া । সা গা মা I পা -ধা -ণা । র্সা -া -া)} I
ক থা০ ০ এ নে ছ টা ০ ০ নি ০ ০

I {মা -ধা ধা । ধা না না I র্সা -া -া । -া -া -া I
ছ ন্ দে গেঁ থে ছ হা ০ ০ ০ ০ র্

I সা -র্গা র্মা । র্পা র্মা -র্গা I র্রসা -া -া । -া -া -া} I
ম ন্ জ রী স ম্ ভার্ ০ ০ ০ ০ ০

I {না র্রা র্সা । ণা ধা পা I মা -া -া । গা -া -মা I
সু র ভি ত ভা ষা ত ০ ০ ব ০ ০

I পা পা ধা । ণপা -র্সা ণা I ধা -া -া । -া -া -া} II
ভু ব ন ভু ০ লা নী ০ ০ ০ ০ ০

II {র্রা র্সা ণা । ধা -পা -মা I গা -া -া । সা রা গা I
এ সে ছি তো ০ ০ মা ০ র্ লী লা ঘ

I মা -া -া । -া -া -া I মা পা পা । পা মা গা I
রে ০ ০ ০ ০ ০ মু কু লি ত গী ত

I মা -া -ণা । ধা -া -া I ধা ধা না । না র্সা -া I
মো ০ ০ ব ০ ০ এ নে ছি থ রে ০

I না র্সা া । -া -া -া} I মা ণা ধা । ধা ধা না I
থ রে ০ ০ ০ ০ এ বি তা লে ঝি বি

I র্সা া -া । -া -া -া I র্সা র্গা র্মা । র্পা র্মা র্গা I
ঝিব্ ০ ০ ০ ০ ০ শি হী যে ব ম ন্

I র্কসা -া -া । -া -া -া I না র্ধা র্সা । ণা ধা পা I
জীব্ ০ ০ ০ ০ ০ বা জা যে দি যে ছ

I মা -া -া । -গা -া -মা I পা পা ধা । পা -সা শা I
দো ০ ০ ০ ০ ল্ হৃ দ য় দু ০ লা

I ধা -া -া । -া -া -া II II
নী ০ ০ ০ ০ ০

১০

কোথা হতে এলে, কোথা যাবে তুমি কে জানে!
তবু জানি রবে চিরদিন নিভৃতের ধেয়ানে।
বনে অকারণ পুলক তোমার লাগে,
মনে অরূপের মোহন বিলাস জাগে,
এই আসা-যাওয়া গেঁথে লব আজি কি গানে!
অতিথি তোমারে পরাব সুরের মালা,
অনুরাগ-দীপে করিব ভবন আলা।
তব উদ্দাম নৃত্যছন্দে মাতি,
উৎসুক হিয়া কাটাবে দিবসরাতি,
বনবীথিকারে মুখরিত করি কি গানে!

II রা গা ধা । ৺পা মা গা I রা মা ৺পা । রা সনা সা I
কো থা হ তে এ লে কো থা যা বে তু মি

I রা গা মা । -া গা রা I রা পা পা । পক্ষা পক্ষা পা I
কে জা নে ০ ত বু জা নি ব বে চি০ র

I পা -র্সা -নর্সা । -ধণা -পা -বা I -বা গা মা । পা রা গা I
দি ০ ০০ ০০ ০ ন্ নি ভৃ তে ব ধে যা

I মা -পা -ধা । ৺পা মা -গা II
নে ০ ০ ও গো ০

-া -া II পা পা পা । না ৺ধা -না I র্সা র্বা র্বা । র্গরা র্সা -না I
ব নে অ ক ব ণ্ পু ল ক তো মা র্

I না র্সা -া । -া -া -া I র্সা র্গা ৺রা । র্গা র্মা র্গা I
লা গে ০ ০ ০ ০ ম নে অ রু পে র

I র্রা র্গা র্মা । র্গা র্রা র্সা I র্সা -া -না । ধা -া -না I
মো হ ন বি লা স জা ০ ০ গে ০ ০

I র্সা -র্গা র্পরা । র্সা না র্সা I ধা ণা ধা । পা রা গা I
এ ই আ সা যাও য়া গেঁ থে ল ব আ জি

I মা -গা ৺ধা । পা -া -রা II
কি ০ গা নে ০ ০

-া -া II {মা পা পা । পা পা পা I পা ধা না । না র্সা ৺না I
অ তি থি তো মা রে প রা ব সু রে র

I ধনা -র্সা র্পর্সা । ধপা -া -া I (পা ধর্সা র্সা । র্সা র্সা র্রর্সা I
মা ০ ০ লা০ ০ ০ অ নু রা গ দী পে

I ৺না র্সা না । না ধা পা I পা -া -ধা । না -া -মা)} I
ক রি ব ভ ব ন আ ০ ০ লা ০ ০

I পা পা পা । -না ৺ধা না I র্সা -া -র্রা । র্গরা -া র্সা I
ত ব উ ০ দ্দা ম নৃ ০ ত্য ছ ন্ দে

I ণা র্সা -া । -া -া -া I র্সা র্গা র্ঋা । র্গা র্মা র্গা I
মা তি ০ ০ ০ ০ উ ৎ সু ক হি য়া

I র্রা র্গা র্মা । র্গা র্রা র্সা I র্সা -া -ণা । ধা -া -ণা I
কা টা বে দি ব স র ০ ০ তি ০ ০

I র্সা র্সর্গা ঋা । র্সা ণা র্সা I ধা ণা ধা । পা রা গা I
ব ন শ্রী থি কা রে মু খ রি ত ক রি

I মা -গা ঋা । পা -া -রা II II
কি ০ গা নে ০ ০

১১

পলাশ-রাঙা বাসনাগুলি
মনের বনে বিছায়ে,
আজিকে সব করম ভুলি
আসীন তারি নিছায়ে।
সুদূরে কে যে বাজায় বাঁশি,
অলস বেলা মন উদাসী,
ভাবনা মোর নয়নজলে
দিয়েছি সিঁচায়ে।
বঁধুর বনে কুসুম ফোটে
গন্ধ আসে তার,
বরণ তার মানস পটে
আঁকি যে বার বার।
এমনি করে কাটাই বেলা,
সুরের বানে ভাসাই ভেলা,
ভুলে যে গেছি বিভল সুখে
মন যে কি চাহে॥

II ঋা পা পণা । ঋা -া । পা -া I ঋা পা জ্ঞা । জ্ঞঋা -া । সা -া I
প লা শ০ রা ০ ঙা ০ বা স না গু ০ লি ০

I সা সজ্ঞা জ্ঞা । ঋা -া । সা -ণ্‌া I সা -জ্ঞা ঋা । জ্ঞা -া । -া -া I
ম নে০ র ব ০ নে ০ বি ০ ছা য়ে ০ ০ ০

I মা পা পা । ক্ষপা -া । জ্ঞা -মা I পা না না । র্সা -া । র্সা -া I
আ জি কে স০ ০ ব ০ ক র ম ভু ০ লি ০

I ণা র্সা ণা । পদা -া । পা -া I ক্ষা -দা পা । ক্ষপা -জ্ঞা । -মা -জ্ঞা II
আ সী ন অ ০ বি ০ দি ০ য় য়ে০ ০ ০ ০

II র্সা -া -জ্ঞা । র্জ্ঞা -র্রা । র্জ্ঞা -া I র্মজ্ঞা -া -া । র্ঋা -সা । র্সা -া I
সু ০ ০ দূ ০ রে ০ কে ০ ০ যে ০ বা ০

I না -র্সা -র্ঋা । ঋা -র্সা । র্সা ণা I প্পা দা ণা । ণা -দা । দা পা I
জা ০ য় বাঁ ০ শি ০ অ ল স বে ০ লা ০

I পা -ণা ণা । ণা দা । -া -পদা I পা -া -া । া -া । া -া I
ম ন্ উ দা ০ ০ ০০ সী ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা পণা ধা । ণা -া । -া -া I পর্সা ণা ণা । দা া । পা া I
ভা ব০ না মো ০ ০ র্ ন য় ন জ ০ লে ০

I পক্ষা পা দা । দা -া । পা া I পক্ষা -পা -জ্ঞা । -মা -া । জ্ঞা া II
দি য়ে ছি সি ০ চা ০ য়ে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {সা ঋা ঋা । ঋা -বা । ঋা -া I জমা ঋা ঋা । ঋা -া । সা া I
বঁ ধু ব ব ০ নে ০ কু সু ম ফো ০ টে ০

I সা -ঋা ঋা । ঋা -া । সা -ন্া I সা -া -া । -া -া । -া -া I
গ ন্ ধ আ ০ সে ০ তা ০ ০ ০ ০ ০ র্

I সা ঋা ঋা । ঋা -া । জ্ঞা -মা I মা পা পা । পা -া । পা -া I
ব র ণ অ ০ র ০ মা ন স প ০ টে ০

I ক্ষা পা ঋা । ঋা -মা । জ্ঞমা-পক্ষা I পা -া -া । -া -া । -া -া} I
আঁ কি যে বা ০ ব০ ০০ বা ০ ০ ০ ০ ০ র্

I ক্ষা -পা ঋা । ঋা -া । ঋা -মা I পা না -া । র্সা -া । র্সা -া I
এ ম্ নি ক ০ রে ০ কা টা ই বে ০ লা ০

I না র্সা র্জ্ঞা । র্ঋা -া । র্সা -া I ক্ষা -া -া । র্সা -া । -া -র্ঋা I
সু রে র বা ০ নে ০ ভা ০ ০ সা ০ ০ ই

I ণ -র্সা -ণা । -ণা -া । -া -র্সা I ণর্সা র্সা ণদা । দা -া । পা -পা I
ভে ০ ০ লা ০ ০ ০ ভু০ লে যে০ গে ০ ছি ০

I পা ণা ণদা । দা -া । পা -া I ম্মা -পা দা । দা -া । পা -া I
বি ভ ল০ সু ০ খে ০ ম ন্ যে কি ০ চা ০

I পম্মা -পা -জ্মা । -মা -া । -জ্মা -া IIII
হে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১২

পথপাশে মোর রচিনু দেউল্
পথিক নিতুই আসে যায়।
কেহ আনন্দে হাসিয়া আকুল
কেহ মূর্ছিত বেদনায়।
সে চলার পথে হৃদয় আমার
ধায় অকারণে, ফেরে বার বার,
দেবতা আমার চলে তারি সাথে
ভোলে না পূজার খেলনায়।
দিনের আলোকে, নিশীথে আঁধারে,
বনে প্রান্তরে, কুটিরের দ্বারে,
চরণের ধ্বনি বাজে তালে তালে
বাজিবে আমার চেতনায়।
চলাতেই জাগে জনম মরণ
কালের বাঁধন ঘুচে যায়,
আদি ও অন্ত লভিল মিলন
যাত্রীদলের পায়-পায়॥

[পমা গমা]
II মগা মা মগা । দা পা -দা । মা পা দা । মপা পা -া I
প০ থ পা০ শে মো র্ র চি নু দে০ উল্ ০

I গপা পা -া । ঋা সা -ন্া । সা রমা মা । -া -া -া I
প০ থি ক্ নি তু ই আ সে০ যা ০ ০ য়্

I মা মা মা । পা -গা গা । মা দা দা । না র্সা -া I
কে হ আ ন ন্ দে হা সি য়া আ কু ল্

I সমা মা মা । -া মা মা । মগা মা মদা । া া া II
কে০ গ মু ব ছি ও বে০ দ না০ ০ ০ য়

II দা দা দা । -া না র্সা । র্ঋা র্ঋা র্সা । না র্সা া I
সে চ লা র প থে হৃ দ য় আ মা র

I র্সা -র্ঋা র্ঋা । ঋা র্সা র্সা । ণা র্সা ণা । দা পা া I
ধা য অ কা র ণে যে বে দ ন ব্যা র

I পা দা র্সা । র্ঋা র্সা -া । ণা র্সা ণা । দা পা পা I
দে ব তা আ মা র চ লে তা নি সা থে

I সা ঋা মা । মা মা া । মগা মা মদা । া া া II
ভো লে না পূ জা র খে০ ল না০ ০ ০ য়

II সা ঋা -া । ঋা সা সা । ন্া সা ঋা । ঋা সা সা I
দি নে র আ লো কে নি শী থ আঁ ধা রে

I সা ঋমা মা । া মা মা । গা মা গা । ঋা ঋা সা I
ব নে০ প্রা ন্ত রে কু টি রে প্র দ্বা রে

I ন্া সা গা । ঋা ঋা সা । ণ্া সা সঋা । ণ্সা দা ণ্া I
চ র ণে র ধ্ব নি বা জে তা০ লে০ তা লে

I ণ্া সা ঋা । গা গা -পা । গা ঋা সা । -া -া -া I
বা জি ছে আ মা র্ চে ত না ০ ০ য়্

I মা ণদা দা । -া ণা র্সা । র্ঋা র্ঋা র্সা । না র্সা -া I
চ লা০ তে ই জা গে জ ন ম ম র ণ্

I দা দা -া । ণা র্সা -র্জা । র্ঋা র্ঋা র্সা । -া -া -া I
কা লে র্ বাঁ ধ ন্ টু টে যা ০ ০ য়্

I র্সর্ঋা র্ঋা র্ঋা । র্ঋা -র্ঝা র্ঋা । র্ঋর্ঋা র্মা র্ঋা । র্ঋা র্সা -া I
আ০ দি ও অ ন্ ত ল০ ভি ল মি ল ন্

I ণা -পণা ণা । ন্দা পা -া । গা -মা মদা । -া -া -া II II
যা ০০ স্ত্রী দ লে র্ পা য়্ পা০ ০ ০ য়্

১৩

যারে ভালোবেসেছিলি
সে কি শুধু আছে মনে
আপনারি জালবোনা স্বপনের
কোণে কোণে।
প্রভাত বীণায় আজি
তারি স্মৃতি উঠে বাজি
ব্যথাভরা ম্লান হাসি
বিকশিত ফুলবনে।
দখিন পবন তারি পরশ বুলায়
পাতায় পাতায় সে যে আঁচল দুলায়।
নীলাকাশে মনে লাগে
করুণ নয়ন জাগে
বিরহ কাঁদন তারি
শুনি কাকলি-কূজনে।

[দা]
দ্‌া ণ্‌া II মা জ্ঞা ঋা । সা ণ্‌া -সঋা । সা -া -া । -া সা সা I
যা রে ভা ল বে সে ছি ০০ লি ০ ০ ০ সে কি

I সা সদা দা । পা মা -ক্ষা । মা -া -া । -া -া -া I
শু ধু০ আ ছে ম ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

I মা ক্ষা মা । জ্ঞা রা -জ্ঞা । ঋরা মা জ্ঞা । ঋা সা -ণ্‌া I
আ প না রি জা ল্ বো না স্ব প নে র্

I সা -া -ঋা । মজ্ঞা ঋা -া । সা -া -া । -া দ্‌া ণ্‌া II
কো ০ ০ ণে কো ০ ণে ০ ০ ০ "যা রে"

-া -া II {দা দা দা । ণা র্সা -র্ঋা । র্সণা -র্জ্ঞার্ঋা -া । র্সা -া -া I
০ ০ প্র ভা ত বী ণা য় আ ০০ ০ জি ০ ০

I ণা র্সা র্ঋা । র্সা ণা ণা । পণা -দপদা -া । পা -া (-দা)} । I
আ রি স্মৃ তি উ ঠে ব্যা০ ০০০ ০ জি ০ ০ ০

I পা দা পা । মা জ্ঞা ঋা । জ্ঞা -া ঋা । জ্ঞা -া ঋা I
ব্য থ ভ র ম্লা ন হা ০ ০ সি ০ ০

I মা পা দা । ণা দা পা । মা জ্ঞা -া । ঋা সা -া II
ঝি ক মি তে ফু ল ব নে ০ "যা রে" ০

-া -া II সা মা মা । মা মা মা । মা -া -া । মা -া । I
০ ০ দ খি ন প ব ন আ ০ ০ বি ০ ০

I মা পা দা । মপা মা -া । -া -া -া । -া -া -া I
প র শ বু লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

I মা মা -পা । দা ণা -র্সা । পণা পদা -পা । মজ্ঞা -া -ঋা I
পা তা য় পা তা য় সে ০ ০ যে ০ ০

I সা ঋা জ্ঞা । ঋা সা -া । -া -া -া । -া -া । I
আঁ চ ল দু লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

I {দা দা ণা । র্সা র্সঋা র্সা । ণা র্সা -া । -া -া -া I
নী লা কা শে ম০ নে লা গে ০ ০ ০ ০

I ণা র্সা ণা । দা পা দা । •মা -া -পদা । •পা -া -া} I
ক রু ণ ন য় ন জা ০ ০০ গে ০ ০

I পা দা পা । মা জ্ঞা ঋা । জ্ঞা -া -ঋা । জ্ঞা -া -া I
বি র হ কাঁ দ ন আ ০ ০ রি ০ ০

I মা পা দা । ণা দা পা । মা জ্ঞা -া । ঋা সা -া II II
প নি কা ক লি কূ জ নে ০ "যা রে" ০

১৪

যদি এ মনে সঙ্গোপনে
শুনাও তব বাণী,
তবুও ঐ পুণ্য নাম
কেমনে মুখে আনি!

আসিবে যদি চরণ ফেলে
সকল বাধা দু-হাতে ঠেলে,
কেমনে প্রভু চরণ তবু
হৃদয়ে লব টানি!
তোমার ঐ পুণ্য নাম
কেমনে মুখে আনি!
কেবলি ভয়ে নিজেরে স্মরি,
দূরেতে সরে যাই ;
নিয়ত মোরে অভয় দিতে
নিকটে এসো তাই!

যতই বলি নাহি যে কেহ,
ততোই তব বাড়ে যে স্নেহ ;
তোমারে যেই জানে না,
তারে আপনি লহ জানি!
তোমার ঐ পুণ্য নাম
কেমনে মুখে আনি!

II	সা	সা	সদা	।	দা	দা	।	পা	-া	পা	।	পমা	পা	I
	য	দি	এ	।	ম	নে	।	স	০	ঙ্গো	।	প০	নে	
I	পঋা	পজ্ঞা	-া	।	পমা	পা	।	পা	-ণদপা	মজ্ঞা	।	-ঋা	-সা	I
	শু০	নাও	০	।	ত০	ব	।	বা	০০০	ণী০	।	০	০	
I	সা	সজ্ঞা	জ্ঞা	।	জ্ঞা	-া	।	জ্ঞরা	-জ্ঞা	ঋা	।	সা	র্সা	I
	ত	বু	ও	।	ঐ	০	।	পু	০	ণ্য	।	না	ম	
I	সা	র্সা	র্সা	।	র্সঋা	র্সা	।	ণা	-দপা	পণা	।	-দা	-পা	II
	কে	ম	নে	।	মু	খে	।	আ	০০	নি০	।	০	০	

	I	মা	ম্দা	দা	|	দা	ণা	|	ণা	র্সা	র্সা	|	র্সা	র্সা	I
(১)		আ	সি	বে	|	য	দি	|	চ	র	ণ	|	ফে	লে	
(৩)		য	ত	ই	|	ব	লি	|	না	হি	যে	|	কে	হ	
	I	ম্পা	দা	দা	|	ণা	র্সর্জ্ঞা	|	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	|	র্ঋা	র্সা	I
(১)		স	ক	ল	|	স্ব	ধা০	|	দু	হা	তে	|	ঠে	লে	
(৩)		ত	তো	ই	|	ত	ব০	|	বা	ড়ে	যে	|	স্নে	হ	
	I	র্সা	র্সর্জ্ঞা	র্জ্ঞা	|	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	|	র্সর্জ্ঞা	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	|	র্জ্ঞর্ঋা	র্জ্ঞা	I
(১)		কে	ম	নে	|	প্র	ভু	|	চ	র	ণ	|	ত০	ব	
(৩)		তো	মা	রে	|	যে	ই	|	জা	নে	না	|	তা০	রে	
	I	ণর্সা	র্সা	র্ঋা	|	র্ঋা	র্সা	|	ণর্সা	-র্ঋা	র্সা	|	।	।	I
(১)		হৃ	দ	য়ে	|	ল	ব	|	টা০	০	নি	|	০	০	
(৩)		আ	প	নি	|	ল	হ	|	জা০	০	নি	|	০	০	
	I	সা	সজ্ঞা	জ্ঞা	|	জ্ঞা	-া	|	ঋরা	-জ্ঞা	ঋা	|	সা	সা	I
		ত	বু	ও	|	ঐ	০	|	পু	০	ণ্য	|	না	ম	
	I	সা	র্সা	র্সা	|	র্সর্ঋা	র্সা	|	ণা	-দপা	পণা	|	-দা	-পা	II
		কে	ম	নে	|	মু	খে	|	আ	০০	নি০	|	০	০	
	I	{সা	সা	সণ্‌া	|	দ্‌া	ণ্‌া	|	ণ্‌া	সা	সা	|	সা	সা	I
(২)		কে	ব	লি০	|	ভ	য়ে	|	নি	জে	রে	|	স্ম	রি	
	I	সা	সজ্ঞা	জ্ঞা	|	জ্ঞরা	জ্ঞা	|	জ্ঞা	-ঋা	-া	|	ঋসা	-া	I
(২)		দূ	রে	তে	|	স০	রে	|	যা	০	০	|	০	ই	
	I	সা	সজ্ঞা	জ্ঞা	|	জ্ঞরা	জ্ঞা	|	জ্ঞদা	পা	মা	|	জ্ঞরা	জ্ঞা	I
(২)		নি	য়	ত	|	মো০	রে	|	অ	ভ	য়	|	দি০	তে	
	I	জ্ঞমা	মা	জ্ঞা	|	জ্ঞা	ঋা	|	সা	-া	-া	|	-া	-া}	I
(২)		নি	ক	টে	|	এ	স	|	আ	০	০	|	০	ই	

পত্র-কবিতা

১ Stephen Mansion
10.6 32

কল্যাণীয়াসু,

মৈত্রেয়ী লিখেছ দু-এক ছত্র
নাতিদীর্ঘ এক পত্র
পেয়ে খুশি হয়েছি অবশ্য।
জবাবে লিখিব মস্ত
চিঠি, তাতে নই অভ্যস্ত,
জানই তো অগাধ আলস্য
বাঁধিয়া কোমরবন্ধ
মিল খুঁজি গাঁথি ছন্দ,
কবি তুমি, কোরো না তা তুচ্ছ।
করিও কৃপা কটাক্ষ
কবি এ অধম আখ্য
ভেবো কৃপা দীনেরে বিলুচ্চ।
নগাধিরাজের বক্ষ
জুড়ি থাক্ যক্ষ রক্ষ
মোরা পলায়ন লাগি ব্যগ্র।
সারাদিন বৃষ্টি-বৃষ্টি
এ যে বড় অনাসৃষ্টি
ঢের ভালো গরম উদগ্র।
স্বর্গ চেয়ে ভালো মর্ত্য,
গরমেতে কে বা মর্‌ত
পুরাকালে বল দেখি মৈত্রী।
সরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা
ধড়েতে রাখিত প্রাণটা
পানে দিত জায়ফল ও জৈত্রী।
বন্ধু সবে দিল লম্বা
দেখাইয়া কাঁচা রম্ভা
একা হেথা রহিব কি জন্য?

অশ্রু নামে বাহি গণ্ড
শোকাবেগ কী প্রচণ্ড
আমি ছাড়া কে বুঝিবে অন্য।
"নামিব আগামী হপ্তা"
এই মন্ত্র হল জপ্তা
হরষে বাহির করি দন্ত।
মহানগরীতে ঢুকি
হব Lansdowne-মুখী
ভাবনা কী, আছে দুই বোন্ তো।
আজ তবে টানি দাঁড়ি
কলম বদের ধাড়ি
মসী শুষি খাইল সমস্ত,
যথা ঐ লম্বা দাড়ি
চাচা, যে চালায় গাড়ি
দোকানেতে খায় গরু-গোস্ত॥

দেখো হুড়মুড় করে কত বড় চিঠি লিখলুম। তোমরা স্নেহাশীর্বাদ জেনো, বাবা, মাকে নমস্কার দিও। ইতি

তোমাদের
দিনদা

২ মৈত্রেয়ী

পঞ্চ পাণ্ডবের তরে রাঁধিলা দ্রৌপদী ;
তারি গুণগান গাহি রচিলা চৌপদী
দ্বিপদ রসিক কবি। এই কলি যুগে
অম্লশূল বেদনায়, ম্যালেরিয়া ভুগে
আহার কাহার বলো আছে সেই মতো?
যত খায় পিঠেপুলি সোড়া খায় ততো।
শুকতুনি ঝোলভাত বড়জোর চপ্
দু-খানা লুচির সাথে চা দু-এক কাপ্,
তার সাথে দুই সন্ধ্যা হরিনাম জপ্—
তারপরে সেই অন্তিম ফুল্‌স্টপ্।
যেই কটা দিন তাই থাকি ধরাধামে
খাই পেট ভরে আর ভজি সীতারামে।
ভজনা ও ভোজনের আয়োজনে ভাই
আমন্ত্রণ লিপিখানা তোমারে পাঠাই

১০ নয়, ন তারিখ
রবি নয় সোম
ষ্টিফেন বারিক
ফ্ল্যাট অষ্টম

দিনেন্দ্র

৩ মৈত্রেয়ী পিঠেগুলি ছিটেফোঁটা শুধু এক রত্তি
ভাবিনু পাঠালে বুঝি। ওমা, কী বিপত্তি!
দোঁহে মিলি খাব কত? খাইতে আপত্তি
করি নাই। নিশ্চয় দানব কি দত্যি
আখ্যা লাভ হত যদি দেখে যেতে, সত্যি।
খেয়ে নিই, আছে পরে রোগ আর পথ্যি।
খেতাব তোমারে দেব ভাবিয়াছি চিত্তে,
সেবা দেব কেহ পরে পাবেনাকো জিত্‌তে।
রোসো ভাবি। দিই যদি রন্ধনাচার্য
তবে ক্রোধে জ্বলে ওঠা সে যে অনিবার্য।
আশা ছাড়ি আশিসিনু লভ ভালো বর
সুদর্শন হৃষ্টপুষ্ট খাইয়ে জবর।
উদরের পথ বাহি হৃদয়ের দ্বার
হইবে নিমেষে উন্মুক্ত উদার।

মিষ্টতুষ্ট
দিন্‌দা

৪

6/3 Dwarakanath Tagore Lane
8/4/35

ওগো অমলা দত্ত,
চিঠি লেখা বন্ধ কেন, এর কিবা অর্থ?
দিইনি জবাব?
কুঁড়েমি করা যে চিরকালের স্বভাব।
দয়া করে কোরো ক্ষমা
মোরে নিরুপমা!
কুনাল দাদারে পেয়ে পুরাতনদাদা
দূরে দিলে ঠেলে ফেলে যেথা ছাই-গাদা!
ভাব কি কুইনি
কমলা খাবার কালে আঁখি জলে তাহারে ধুইনি?
অত নরাধম
ভাব যদি মরিব যে বাহিরিয়া দম।
হেথা কী গরম!
হোথা আছে মন্দবায়ু স্নিগ্ধ মনোরম।
রুধিয়া দরজা ফেলি খসখসে টাটি
মাটি পরে বিছায়েছি সিলেটের পাটি।
গোপাল বেহারা সদা দাত্রখানা তুলি
ডাবের উড়ায়ে দেয় মস্তকের খুলি।

তুমি হোথা খাচ্ছ বেড়ে পেস্তা আলুবোখ্‌রা
মোটারে মোখারে যাও, নয় লাইমোখ্‌রা।
কমলের হৃদ্‌ যন্ত্র হয়েছে বিকল
বেবি-বেরি হাঁপানির এই শেষ ফল!
আজও শয্যাগত
শুশ্রূষার তরে nurse লেগে অবিরত।
দুর্ভাগ্য একেলা নাহি আসে,
যথা গরুর গাড়ির সাথ jelly-র সকাশে।
বুড়ি দিল ডুবি লাফ পারাবার পারে
এবারে
লালমুখো সাথে বুড়ি ফিরিবে স্বদেশে,
বিবিয়ানা বেশে
হাইহীল খটমটি যাবে বোলপুরে!
চেঁচাবে কুকুরে,
কলেজের প্রফেসার চা খাবার আশে
মালঞ্চ আবাসে
নিত্য দেবে হানা,
শান্তি গাহিবে গান তোম্‌ তা না নানা।
আজ Good bye
চিঠি যেন পাই।
অনেক স্নেহাশীর্বাদ।

শুভার্থী
দিন্‌দা

Sreemattee Amala Dutta
C/o. Rai P. C. Dutt Bahadur CIE
Executive Councillor
Shillong
Assam
কুনাল সেন। ময়ূরভঞ্জের মহারানীর ভাইপো
হোথা—শিলং
বুড়ি—নন্দিতা

৫

6 Dwarkanath Tagore's Lane
Jorasanko
Calcutta

অমিয়া অমলা
পাইয়া কমলা
লিখিছে কমলাকান্ত
দ-এ হ্রস্ব ই—ন এ কার,—ন এ দ এ রফলা,

বিফল জীবন মম হল আজি স-ফলা
দলিয়া কমল-করে
রস লয়ে সমাদরে
দিল যবে করিবারে পান,
আমি তাহা ঢালি মুখে
মেরে দিনু এক চুমুকে,
আনন্দে হইনু চিৎ মুদি দু-নয়ান।
মনে পড়ে বোল কথা,
ছোটো ঘরে সমাগতা
দুটি বোন সহাস্য বদন
করিত গীত-অমৃত-বারিধি মথন।
হা হতোস্মি কোথা ঘর, কোথা গেল গান!
ধোঁয়া ঢাকা শহরেতে এবে অবস্থান।
নাহি হাসি নাই গল্প,
রস প্রাণে ছিল অল্প
তাও যে শুকায়ে গিয়ে হল মরুভূমি।
কোথায় রহিল বুড়ি, অমলা কোথায় গেলে তুমি।
মনো দুখে আজি দিন্‌দা
অদৃষ্টেরে করে নিন্দা,
করে কিন্তু হবে কী বা বল্‌,
কাক যেন ঠোকরায় মিছে বিম্বফল।
মিল গাঁথা ছাড়ি
এইখানে দাঁড়ি
দিনু তবে টানি।
শতবর্ষ জিও,
এই শুভাশিস নিয়ো,
লিখিনু কেমন পত্র, বড় কতখানি।

শুভার্থী
দিন্‌দা

Sreemati Amala Dutta
C/o Rai P.C. Dutt Bahadur CIE
Executive Councillor, Shillong, Assam.

ছাত্র ও বন্ধুবর্গের খাতায় স্বাক্ষরিত খণ্ডকবিতা

১

বাণী যার নাহি পায় কূল
        সুর সেথা করে তার খেলা,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে সে দোদুল
        সকল বাঁধন করি হেলা।

২

যে নারী সবার তরে অকাতরে করে প্রেম দান
অক্ষয় ভাণ্ডার তার, কাজ তার চিরদীপ্তিমান।
মানের রাখে না আশা, ভাষা তার সুনিপুণ সেবা ;
চিত্তজয়ী রাজ্ঞী সে যে, আপনার ও পর তার কেবা।

৩

পূর্ণ চাঁদ নীলাকাশে
        সে যে ক্ষণিকের।
বদনে যে শশী হাসে
        মর্ত্য গেহের,
সে দীপ্তি হাসিমুখে
        করে অনুক্ষণ
চিরানন্দে সুখে দুখে
        সুধা বরিষণ॥

৪

বাণীমন্দিরের তুমি নবীনা পূজারি।
প্রবীণ যুবার অর্ঘ্য
ধরায় এনেছে স্বর্গ,
মন্দার স্তবক রচি তারি
সমর্পিনু কম করে,
জানি তুমি লবে তারে তৃপ্ত সমাদরে।
কাব্যরসে যদি বসে মন
সফল হইবে দান, দাতা মহানন্দে নিমগন।
দিন করে প্রাণ ভরে শুভ আশীর্বাদ
মিটুক সকল আশা, পূর্ণ হোক সাধ।

৫

কাব্যবাঁধনে চাহি বাঁধিতে সুমিত্রা
মিল নাহি খুঁজে পাই, অক্ষর অমিত্রা।
মাইকেলি ধরণে যদি লিখি কাব্য,
অনভ্যাস কারণে তা হবে অশ্রাব্য।
"দাদামশাই" তাই দুর্বিপাক গণি
হৃদয়ে রাখিল তার হৃদয়ের "মণি"।

৬

লেখা থাকে, যায় লোক।
রাখে স্মৃতি আর শোক॥
খাতার পাতায় যা তা দিলুম লিখে।
যতন করে রেখো খাতা, যদ্দিন থাকে টিকে॥
অচেনারে চেনা হল, চেনারে অচেনা।
এইমতে পাওনার মেটে শুধু দেনা॥

রবীন্দ্র-সংগীত

কোনো গীতিকবি বা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির সম্বন্ধে বিচার করবার সময়, তাঁর সমগ্র আত্মপ্রকাশের অন্তর্গত ক্রমবিকাশের রূপ সমঝদার বিচারকের চোখে ধরা দেয়। বাহিরের রূপ, রস, গন্ধস্পর্শের তরঙ্গাঘাত শিল্পীর মর্ম-বীণার তারে যে স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, তাই তাঁর অনুভূতির আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে নানা রসসৃষ্টির উৎসধারায় উৎসারিত হয়। অন্তরের ভাবলোকের এবং বাহিরের সৌন্দর্যলোকের মিলনে যে পুণ্য সঙ্গমতীর্থ রচিত হয়, তারি কেন্দ্রস্থলে সকল প্রয়োজনাতীত অনির্বচনীয় রূপ-সৃষ্টিগুলি আপনার পূর্ণ মাধুর্যে বিকশিত হয়ে বলে 'অয়ম্ অহম্ ভো'।—এই আমি আছি। যখন এই প্রাণবান্ সত্তা বর্তিয়া থাকার অনন্দের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে, তখন শাশ্বত আনন্দলোকে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। বাহিরের প্রভাব তখন তার অন্তরকে স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষুব্ধ করে না।

শিল্পসৃষ্টি নিযে পৃথিবীতে যে তর্কজাল বোনা হয়েছে, তাতে আবদ্ধ হয়ে বন্ধনদশা-কাতর অনেক লোক অনেক আর্তনাদ করেছে ; অনুভব করার জিনিসকে বোধগম্য কর্‌বার চেষ্টা করেছে ; indefinable কে define করবার চেষ্টা করেছে। বুদ্ধির দ্বারা তার ব্যবচ্ছেদ করেছে , অনুভূতির দ্বারা সেই রসসৃষ্টির সুষমার অপূর্ব সৌষ্ঠব উপলব্ধি করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতের অভিব্যক্তির ধারা আলোচনা করে দেখ্‌বার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রথম থেকে এ পর্যন্ত তাঁর নব-নব সুরসৃষ্টির ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিখ্‌তে গেলে যে দূরদৃষ্টি ও শক্তির প্রয়োজন, তা আমার নেই ; তবে আমার ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা যতটুকু বুঝেছি, তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর্‌ছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করতেন এবং সাহিত্য আলোচনা ও রচনায় উৎসাহিত হতেন, এ কথা তাঁর জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন। বঙ্কিমযুগের নব জাগরণের প্রথম প্রভাতের অরুণালোকস্পর্শে তাঁর প্রতিভার উদ্বোধন হয়েছিল, এবং পিতা, ভাই, ভগ্নী, সকলের স্নেহচ্ছায়ে ও উৎসাহের অনুকূল বায়ুতে তাঁর নব উন্মেষিত প্রতিভা উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

সংগীতে তাঁর অনুরাগ, রসানুভূতি ও আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা চলে। আমাদের পরিবারে গানবাজনার চর্চা বড় কম ছিল না। বড় বড় ওস্তাদ এসে সেরা সেরা হিন্দী গান (বেশির ভাগ ধ্রুপদ) গাইতেন। আর সেই সুরগুলিতে বাংলাকথা বসিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য গান রচনা করতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সংগীতশাস্ত্র-অধ্যয়নমগ্ন ; পিয়ানোতে বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর গৎ বাজাচ্ছেন আর তাতে কথা বসিয়ে গান তৈরি করছেন কবি নিজে। এই হল গীতরচনার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। বাহিরের প্রভাব এবং tradition-এর ধারা যুগপৎ তাঁকে রসের খোরাক জোটাতে লাগল। মাঝে মাঝে স্বকীয় প্রতিভার রশ্মি tradition এবং ওস্তাদীর গবাক্ষদ্বারের ভিতর দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছিল, কিন্তু আবরণ বিদীর্ণ করে নিজস্ব প্রতিভার দীপ্তি তখনও উদ্ভাসিত হয়নি। ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন পাপক্ষয় করবার একান্ত আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথও ভাবাবেগে গান লিখলেন—'আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে পদে পদে পথ ভুলি হে।' ছ'জনার তাড়নায় কাতর ভাবপ্রবণ অশ্রুবিলাসী শ্রোতাদের তিনি মুগ্ধ করেছিলেন কিন্তু বীণাপাণির আসন তখনও শূন্য ছিল। এ-কথা লিখলুম বলে পাঠক ভাববেন না যে, তিনি সে সময়ে উচ্চদরের সংগীত রচনা করেননি। পরবর্তীকালে যদুভট্ট এবং রাধিকা গোস্বামীর কাছ থেকে সুর আদায় করে তাতে কথা বসিয়ে যে সব ব্রহ্মসংগীত তিনি রচনা করেছিলেন, তা অপূর্ব বাক্য-যোজনায় এবং বীর্যদ্যোতনায় অননুকরণীয় সম্পদে মহীয়ান।

এরপরে দেখা যায় classical সুরগুলির বিশিষ্ট রস আত্মসাৎ করে তিনি গীতিনাট্য রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র গানে classical প্রভাব সুস্পষ্ট। এই গীতিনাট্য দুটির গানগুলি কথা ও সুরের হরগৌরী মিলনের অপূর্ব উদাহরণ। এই সময় আরও কতগুলি গান রচিত হয়, যার lyrical beauty-র তুলনা নেই। বাল্যকালে আমি সে গানগুলি শুনে মুগ্ধ হতুম, তৃপ্ত হতুম, আর আপন মনে গেয়ে যে কী আনন্দলাভ করতুম, তা কথায় বোঝাবার শক্তি আমার নেই। পৃথিবীর সমস্ত একান্ত intimate সম্বন্ধ অতিক্রম করে কোন স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ হতুম কে জানে! গানগুলি হচ্ছে 'আকুল কেশে আসে', 'আহা জাগি পোহাল বিভাবরী', 'আজি শরত তপনে', 'তোমার গোপন কথাটি' ইত্যাদি। কথার অর্থ আমার কাছে এত অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, সে সময়কার কোন রবীন্দ্রবিদ্বেষী যখন আমাকে বললেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'আহা জাগি পোহাল বিভাবরী', এ গানটি কোন প্রেমিকাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, তখন যে কী আহত হয়েছিলাম বলতে পারিনে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতের এরূপ বস্তুতান্ত্রিক অর্থ অনেকেই করত।

রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ের গানগুলিকে emotional আখ্যা দিয়াছেন। Emotional তো বটেই! Lyric মাত্রই emotional, কিন্তু সে emotion intimate নয়। এ যেন ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখের দ্বন্দ্বের অতীত কোন্ এক অক্ষুব্ধ সরসীনীরে বিকশিত শতদল—'তার বাঁধন যে নাই'। এই detachment হল art-এর মূল কথা।

কবির সমস্ত কাব্যজীবনের ধারার মধ্যে দেখতে পাই তিনি অধ্যাত্মজগতের এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁচেছেন, যেখানে তাঁর দৃষ্টি বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যতকে অতিক্রম করে শাশ্বত আলোকের আনন্দে উদ্ভাসিত। এ দৃষ্টির সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্যবাণীর অব্যাহত স্রোত বৈদিকযুগ থেকে এ কাল পর্যন্ত বয়ে অসছে, এবং নানা যুগের নানা সমস্যার ঘাতপ্রতিঘাতে নানা সমাধানে উপনীত হয়েছে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ human interest। আমার তো মনে হয় যে তিনি intensely human। আর একদিকে দেখতে পাই তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি। যা-কিছু

প্রাণবান্, যা-কিছু আপনার আনন্দবেগের প্রেরণায় আপনাকে নিঃশেষে দান করেছে এবং নব নব জীবনের পূর্ণতায় বিকশিত হচ্ছে, তাকেই তিনি একান্ত আপনার করে নিয়েছেন। তাঁর রচিত 'ছিন্নপত্র' বইটি যিনি পড়েছেন, তিনি বুঝতে পারবেন আমি কেন এ কথা বলছি। অধ্যাত্মজীবনের পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কাছে মানুষ এবং প্রকৃতির ব্যবধানের বাঁধ ভেঙে গেছে, দুই-ই তাঁর পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছে।

সত্যের চরম উপলব্ধির শাশ্বত আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যখন বাণীর বরপুত্রের আসনে আসীন, তখন তাঁর সুরশিল্পসাধনার পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাই। যে কথা নানারূপে নানা ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে, তা সুরের ব্যঞ্জনায় অরূপ মূর্তিতে উল্লাসিত হয়ে আনন্দলোকের রহস্যের দ্বার অবারিত করে দিয়েছে। ধ্যান-সমাহিত চিত্ত সুরের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছে বলে অন্তরের সুরের নির্ঝরিণী কলস্বরে ধাবমান—'কার সাধ্য রোধে তার গতি।'

কবির আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ অপূর্ব বাণীর সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের বাণীর ভাবের মিল আছে, এ কথা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু বাণী এবং সুরের অপূর্ব মিলনে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে আদর্শ স্থানীয় হয়েছে কবির আধুনিক গানগুলি, যার আরম্ভ 'গীতপঞ্চাশিকা'য় এবং 'গীতি-বীথিকা'য়। পরবর্তী রচনায়—'নব-গীতিকা' এবং গীতিমালিকা'র গানগুলিতে এ আদর্শের চরম পরিণতি পরম সৌষ্ঠবে অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এ গানগুলিতে দেখতে পাই সুরের surprises। শৈলারোহণের সময় মোড় ফিরে অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিমাধুর্য দেখে মনটা যেমন চমকে ওঠে, এও সেইরকম। কথাগুলো ভালোমানুষের মতো মগজের এক কোণে চুপ করে পড়েছিল। সুরগুলো নৃত্যচপল ভঙ্গীতে ঘিরে ঘিরে তাকে এমন একটি অপ্রত্যাশিত রূপদান করলে, যা দেখে রসিক-চিত্ত বললে 'বাঃ, এরকমটি তো ভাবিনি!' আমার মনে হয় কবি হয়তো নিজেই জানেন না, কেমন করে সুরগুলো আপন গতিবেগের প্রেরণায় আপনি decorative design গুলো তৈরি করল—যার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। যে সুরটা গড়ে উঠল, সেটা কালোয়াতিও নয়, বাউলও নয়। তা সম্পূর্ণ খেয়ালী। জ্ঞানলব্ধ দুর্বিদগ্ধ বলবেন 'হেয়ালি'।

গান তৈরি করবার সময় তাঁর কাছে বসে থেকে আমার বারবার মনে হয়েছে যে, সুরের পাগলামিকে তিনি কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারছেন না ;—খাবার তাড়ায়ও না, কাজের তাড়ায়ও না। একটা গানের সুর দিচ্ছিলেন, সেটা হচ্ছে—'একটুকু ছোঁওয়া লাগে'। সুর অভিমানিনী প্রেয়সীর মতো মুখ ঘুরিয়ে বসল, মানভঞ্জনের পালা শেষ করে কবির মন যখন সুরকে লক্ষ্য করে বললে 'আচ্ছা নাও, তোমার হাতে আমার বাণী সমর্পণ করলুম'—অমনি গানটি তৈরি হল ; কথা বললে আমি ধন্য, সুর বললে আমি পূর্ণ। আমার মূল বক্তব্য এই গানগুলির সম্বন্ধে এই যে, মধ্যযুগের কবিদের সঙ্গে বাণীর ভাবের মিল থাকতে পারে, কিন্তু গান হিসাবে অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টির হিসাবে কবির গানগুলিকে বোধহয় আরও উচ্চস্থান দেওয়া যেতে পারে। অন্তত আমার এই মনে হয়, আর 'বুঝিবে কী ধন রসিক যে জন।'

ঋতুসংগীত সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। 'বসন্ত" ও 'সুন্দর' এ দুটি কবির অপূর্ব সৃষ্টি। অনেক কবি প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে তার জয়গান করেছেন শতমুখে। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলার রসমাধুর্য উপভোগ করে তার সঙ্গে এমন নিবিড় আত্মীয়তার

সম্বন্ধস্থাপন এবং তার রহস্যালোকের দ্বার উদ্ঘাটন আর কোন কবি করেছেন কিনা জানিনে। প্রত্যেক কিশলয়ের অব্যক্ত কাকলিতে, প্রতি কুসুমের বর্ণগন্ধময় আত্মনিবেদনে, প্রতি ঋতুসমাগম ও অবসানের মিলনবিরহের বেদনায় কবির মন আনন্দে আকুল ও বিরহে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বাইরের বিরহমিলনের অন্তরালে যে মায়াময় রহস্যলোক রয়েছে, তার অরূপ মাধুর্যের সন্ধান, পাওয়া-না-পাওয়ার অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদন পেয়ে কবির মন গেয়ে উঠল 'ও কি এল, ও কি এল না।' গভীর অনুভূতির আনন্দ যেমন মানুষকে সুখদুঃখের, মিলনবিরহের, জন্মমৃত্যুর অতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে, তেমনি প্রকৃতিও অন্তর্নিহিত গভীর সত্তার পরিব্যাপ্ত চৈতন্যে উদ্বোধিত হয়ে প্রাণের নব নব প্রকাশে জয়পরাজয়ের বাণী নিত্যনিয়ত ঘোষণা করছে। এই বিজয়বার্তার সান্ত্বনার বাণী, এই একান্ত আত্মীয়তার রূপ কবির ঋতুসংগীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।*

সংগীত-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ভট্টাচার্য মহাশয়দের একান্নবর্তী পরিবার এতদিন সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করছিল। সকালে ঠাকুরপুজো থেকে আরম্ভ করে, শ্রীমণ্ডপের সান্ধ্যসম্মিলনের তাসভাঁজা ও তামাক-সাজা পর্যন্ত এমন সুনিয়ন্ত্রিত ছিল যে, দেখে সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হত যে, হ্যাঁ—একটা সদ্‌ব্রাহ্মণ বটে। বাহ্যিক এবং আন্তরিক দুইপ্রকার শাসনের দৃঢ়বন্ধনে বাড়ির ছেলেমেয়ে বড়-ছোটো এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে, তাহারা সচল কি অচল—এ প্রশ্ন অদ্যাপি কারো মনে জাগেনি। বাহিরের অশুচিসংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে এমন পবিত্র জীবনযাপন কলিকালে দুর্লভ। অন্তঃপুরচারিণী কুললক্ষ্মীদের অস্তিত্ব এমন রহস্যময় যে, তাঁদের কর্মজীবনের ক্ষুদ্র পরিধির দুর্গপ্রাকার ভেদ করে এমন সাহস বিশ্বচারী আলো-বাতাসেরও ছিল না—মানুষের কলুষদৃষ্টি তো দূরের কথা। এ হেন পরিবারের বহুযত্নগ্রথিত কারাপ্রাচীরের লৌহদ্বারের অর্গল ভেঙে অর্বাচীন ছোকরা এক যখন গ্রাম্য বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে এক লাফে নেমে নিম্ন শ্রেণীর মজুরদের সঙ্গে জুটে, তাদের সর্দার হয়ে Liverpool শহরের নৌকারখানায় পৌঁছল, তখন বাপ তাকে ত্যজ্যপুত্র করলেন, মাতৃব্য-পিতৃব্য সবাই তার নরকগমনের পথ সুপ্রশস্ত করলেন, আর ছেলেপিলেগুলো আমবাগানে ঢুকে বলাবলি করতে লাগলো—আমরা একবার লুকিয়ে সাহেবের খানসামার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে রুটি-মাখন মুর্গির ডিম খেয়েছিলুম, দাদা বোধহয় রোজ তাই খাচ্ছে,—কি মজা!

Liverpool থেকে বিবিবৌ নিয়ে যখন দেশে ফিরল, বাড়ির চৌকাঠ পেরোবার আগেই বাপ বল্লে—দূর হও! অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র বল্লে—তথাস্তু, তোমার বাঁধন তোমার থাক, আমার পথযাত্রায় আমায় মুক্তি দাও।

অক্ষুব্ধ শান্তিসমুদ্রে অশান্তির ঝঞ্ঝা এসে লাগল। দুইয়ের সংঘাতে অন্তরের ও বাহিরের প্রাণতরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করল। বাঁধন গেল ছিঁড়ে, বাধা গেল ধূলিসাৎ হয়ে, আর এই ভগ্নস্তূপের উপর আনন্দযজ্ঞের হোমশিখা দীপ্ততেজে জ্বলে উঠল।

* শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রপরিচয় সভার ৪র্থ বার্ষিক ৪র্থ অধিবেশনে পঠিত।

নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে বাস করলে বিপদ হয় এই যে, তার ফলে জড়তা ও অবসাদ এসে শান্তি অশান্তির দ্বন্দ্বসম্ভূত সৃষ্টির প্রেরণার উৎসকে আপন সৃজনবেগে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। দ্বন্দ্বের ফলেই সৃষ্টি ; সুখদুঃখের আলোড়নের ফলেই আনন্দের চরম প্রকাশ।

আমাদের সংগীতের অবস্থাও কতকটা এইরকম। Classical music বলতে আমরা বুঝি হিন্দী গান। তার বড় বড় ইমারৎ, কেল্লা ফৌজ, তার প্রাকারের পর প্রাকার, প্রাচীরের পর প্রাচীর দেখে স্তম্ভিত হই, বাহবা দিই। প্রাচীন-স্মৃতি-সৌধরক্ষা সমিতি সেগুলি সযত্নে রক্ষা করছেন, কিন্তু দৈনিক জীবনযাত্রায় সেগুলো কোনো কাজে লাগে না। এই বিরাট প্রাসাদরচনার মালমশলা নিয়ে নিজের মনের মত করে ছোটখাটো কুটির রচনা করেই আমার আনন্দ।

লোকসংগীতের ধারা আজও বহমান, কেন না জীবনের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে। প্রাণের সঙ্গে যে সৃষ্টির যোগ নেই, তাকে লোহার সিন্দুকে বন্ধ রাখা চলতে পারে, কিন্তু সর্বমানবের আনন্দযজ্ঞে বিতরণের উপযুক্ত যোগ্যতা তার থাকে না—এটা সর্ববাদীসম্মত।

আমি যখন ভৈরবী সুরের আলাপ করি, তখন বিশ্বের পুঞ্জীভূত ব্যাকুলতার সুর তাতে বেজে ওঠে ; এই ব্যাকুলতার সকরুণ মিনতির সুর আমাকে অভিভূত করে। মল্লার রাগিণীর যে বিরহবেদনার আকুলতা, তা সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আমার বেদনা যখন ভাবরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে কথা ও সুরের মিলনে আত্মপ্রকাশ করে, তখন যে ভৈরবী বেজে ওঠে সে আমার ভৈরবী ;—আমার বিরহবেদনায় যে মল্লার বাজে, তা আমার মল্লার। মালমশলা যদি ভৈরবী এবং মল্লারেরই থাকে, তবে ইমারৎ যেটা তৈরী হয়, সেটা আমার তৈরি ; তাই তার ভৈরবীতে শুদ্ধ রেখাবও লাগে, কড়ি মধ্যমও লাগে। আমার কারখানায় তৈরি সুরের আনন্দ আমি জগৎকে বিতরণ করছি, কিন্তু আমার কারখানার দ্বারে বড় বড় অক্ষরে জাজ্বল্যমান রয়েছে 'no throughfare!' আমার সহকর্মী রসিকের বীণার তারে আমার সুর যে ঝঙ্কার তুলবে, সে ঝঙ্কার আমার সুরের সৌন্দর্যের সমগ্র রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখেই বাজবে।

হিন্দী গানে অধিকাংশ স্থলে সুরকেই প্রাধান্য দেয়, কথাকে নয়। তাই তানের বাহুল্য হিন্দী গানে সম্ভব হয়। বাঙ্লা গানে যেখানে কথার আঁটবাঁধুনী, সেখানে খোঁচখাঁচ মীড় ছাড়া তান চলে না। হিন্দী গানে সেই জন্য সারগমও ঢোকানো সম্ভব, কেন না গাইবার সময় গায়ক রসবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও জানিয়ে দেন যে—দেখছো, আমি যেটা গাচ্ছি এটা গুণক্রী, পূরবী নয় ; কেন-না শুনলে তো নিখাদবর্জিত আর কড়ি মধ্যমও লাগাই নি।

কিন্তু আমার মন যখন গায় 'জননী তোমার করুণ চরণখানি হেরিনু আজিকে অরুণ কিরণরূপে'—তখন আমার সুরলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেন 'লাগুক নিখাদ ও কড়িমধ্যম, কথায় সুরে মিলেছে খাসা ; না-হয় গুণক্রী না হয়ে নির্গুণক্রীই হল, কুছ পরোয়া নেহি।'

হিন্দীগানে সেইজন্যে এ-কথা বলে দেবার প্রয়োজন হয় যে—আমি পূরবী গাচ্ছি। সেই পূরবীর বিশেষ ঠাটকে আশ্রয় করে আমার গান গাওয়া হল ; কথার মধ্যে দিনান্তের করুণ মিনতির আভাসমাত্র নেই বলে সুর গেয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় যে, এটা দিন অবসানে গাওয়া উচিত ; প্রকৃতির বুকের ভিতরকার কান্নার সুর আমি পূরবী রাগিণীতে রূপান্তরিত করেছি। কিন্তু আমি যখন গাই—

'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে

সন্ধ্যা বায়ে, শ্রান্ত কায়ে, ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে।'

তখন সুরটা পূরবী হতে বাধ্য, কিন্তু বলবার কোনো প্রয়োজন নেই, এবং তাতে শুদ্ধ ধৈবত লাগালেও সৌন্দর্যের লাঘব হয় না।

বাঙলা গানে যেখানে-সেখানে তান দেওয়া যায় না এই জন্যে যে, বাঙলা গানের কথারও একটা ঠাস্‌বুনানী আছে ; তার সুরকে বাদ দিলেও কথার নিজস্ব রসসম্পদ রয়েছে। কাজেই একটা কথা শেষ করে বাকি কথাটা না বললে, উক্ত কথা বড় বিপদে পড়ে। কেমন হয় জানো? যেমন, আমি যদি গাই 'যদি বেলা যায় গো বয়ে' আর তারপরে যদি ক্রমাগত বলতে থাকি 'যায় গো বয়ে' ; তাহলে তার পরের দুই লাইন—

'জেনো জেনো

আমার মন রয়েছে তোমায় লয়ে'

চীৎকার করে বলতে থাকবে—ওহে, থামহে, আমার কথাটাও বলে ফেল, তাহলে অর্থটাও সম্পূর্ণ হয় আর লোকেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

আজকাল আর একটা কথাও উঠেছে যে, একটা গান বারবার একই রকম করে গাইলে এক-ঘেয়ে হয়ে যায়, তাই প্রতিবার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা দরকার।

এর সম্বন্ধে বলা যেতে পারে ঐ একই কথা যে, পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন হিন্দী গানেতেই চলে ; কেন না হিন্দী গানে কথা ও সুর মিলে একটা সুসম্বদ্ধ অখণ্ড রূপ গ্রহণ করে না। গাইছি গুরুগম্ভীর রাগিণী—সুহা কানাড়া ; তাতে কথা বসালুম 'বল্‌মা রে চুনরিয়া ম্যযকো লাল রঙ্গদে', অর্থাৎ 'হে বল্লভ, আমার ওড়নাটা লাল রঙে রঙিয়ে দাও।' এ চুনরিয়াকে কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত ক্রমাগত টান মারা চল্‌তে পারে ; কিন্তু ঐ সুরই বাংলা কথায় খাপ খাইয়ে 'নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও' গাইবার সময় সে টান সইবে না।

আমি যখন শিল্পীর আসনে অধিষ্ঠান করে রসসৃষ্টি করছি, তখন তার ছাপটা নষ্ট করে নিজের কারদানী দেখানোকে বলা যায় অনধিকার বা মূঢ়তা। গোলাপ যে ফুটেছে, সে গোলাপই থাকবে ; তাতে বেলফুলের শুভ্রতা ও সৌরভ আশা করার মত এমন পাগলামি আর কিছু হতে পারে না। এক সুরে গাইলে যদি গান একঘেয়ে হয়, তবে দোষ হয় গায়কের নয়—শ্রোতার। আর দুইয়েরই যদি দোষ না থাকে, তবে তা Thing of beauty নয়, এবং joy for ever দাবী সে করতে পারে না। তোমার যদি সাদা রসগোল্লা রোজ ভাল লাগে, অকূলের দোকানে কড়াপাকের রসগোল্লার ফরমাস দাও। কিন্তু বেচারী সাদা রসগোল্লাকে সাদাই থাকতে দাও। তোমার না ভালো লাগে, আর কারও ভালো লাগতে পারে ; পৃথিবী থেকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত এখনও লুপ্ত হয়নি। তা না করে তুমি যদি গায়ের জোরে সাদা রসগোল্লায় গুড় মেশাও, তবে রসগোল্লার রসত্ব এবং গুড়ের গুড়ত্ব দুই-ই মাঠে মারা যাবে। আর মিষ্টি যদি একেবারেই ভালো না লাগে, তবে বুঝতে হবে পিত্তাধিক্য হয়েছে, চিকিৎসার দরকার।

আমার মন বলছে, কথায় ও সুরে মিলিত একটি অখণ্ড সুসম্পূর্ণ রসসৃষ্টি করব। সেটা যখন হল, তখন দেখা গেল যে সুরে টোড়ির আমেজ এসেছে। এসে থাকে যদি তবে 'যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও।' সে টোড়ি যদি জীবনপুরী না হয়ে বোলপুরী হয়—তাতেই বা ক্ষতি কী?

জীবনীপঞ্জি

জন্ম

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ষোলো ডিসেম্বর আঠারোশো বিরাশিতে, পৈতৃক বসত কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ, প্রপিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পিতামহ ঋষিতুল্য পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং পিতা দ্বিপেন্দ্রনাথ। তাঁর মাতা ছিলেন লাম্বুটিয়ার রায়চৌধুরি বংশের সুশীলা। অভিনয় ও সংগীতে সুশীলা নিপুণ ছিলেন।

নামকরণ

বাংলার একান্নবর্তী জমিদার পরিবারে জ্যেষ্ঠ সন্তানের অনুক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানের নামকরণে উত্তরাধিকার চিহ্নিত হত নামের আদি অক্ষর দিয়ে। পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পালিত পুত্র প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ভাইদের যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত করে পিতার জমিদারির নির্ব্যূঢ় স্বত্ব লাভ করেছিলেন এবং জমিদারি বহু গুণিত করেছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তান দেবেন্দ্রনাথের নামকরণ করেছিলেন নিজের নামের প্রথম অক্ষর দ দিয়ে। অতঃপর পরিবারের একমাত্র জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারী পুত্রসন্তানটি ছাড়া আর কোনও সন্তানই দ-দিয়ে নামকরণের অধিকারী হলেন না। এই অনুক্রমে দ্বারকানাথ—দেবেন্দ্রনাথ—দ্বিজেন্দ্রনাথ—দ্বিপেন্দ্রনাথ—দীনেন্দ্রনাথ, পাঁচ পুরুষ দ-দিয়ে নামকরণ হয় এবং নিঃসন্তান দীনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গে এই পরম্পরা শেষ হয়। প্রপিতামহ জমিদার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালে পরিবারের সকল পুত্র ও কন্যা-সন্তানদের নামকরণ করতেন। দেবেন্দ্রনাথ অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদে আস্থা স্থাপন করার আগে গৃহে পূজিত হতেন লক্ষ্মী-জনার্দন শালগ্রাম শিলা। অতঃপর দ্বিতীয় ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের গৃহে এই বিগ্রহ স্থানান্তরিত হন এবং তাঁরই উত্তরাধিকারীর গৃহে বর্তমানেও অর্চিত। ব্রাহ্মণ নীলমণি অব্রাহ্মণের দান নেবেন না জেনে বৈষ্ণবভক্ত বৈষ্ণবচরণ শেঠ জোড়াসাঁকোর এই

জমি নীলমণির গৃহদেবতার নামে দেবত্র করেছিলেন। অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী দেবেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানদের নামকরণে বৈষ্ণব পরম্পরা পালন করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের নামের অর্থ দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়। দ্বিপেন্দ্রনাথের নামের অর্থ ঐরাবত বা ইন্দ্রের বাহন। ইন্দ্র দেবরাজ বা দেবেন্দ্র অর্থাৎ দেবেন্দ্রের বাহন দ্বিপেন্দ্র। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন-সাধনাশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথকেই দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই জ্যেষ্ঠ প্র-পৌত্রের নাম বৈষ্ণব পরম্পরায় দীনেন্দ্রনাথ রেখেছিলেন। দীনেন্দ্র শব্দের অর্থ দীনের শরণ, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ। উনিশশো ষোলো অবধি তিনি নামের এই বানানেই পরিচিত ছিলেন; তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বীণ'-এ তাঁর নাম শ্রী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর যাবতীয় রচনাদি, তদকৃত রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি এই বানানেই মুদ্রিত হয়েছে। ঠাকুরপরিবারে নামকরণের বিশেষ তাৎপর্যেই রাখা তাঁর নাম তিনিও এই বানানেই স্বাক্ষর করেছেন।

শৈশব ও বাল্যকাল : দিনেন্দ্রনাথের শৈশব ও বালক বয়স অতিবাহিত হয়েছিল অত্যন্ত স্বচ্ছলতায় ও আরামে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব ও বালক বয়সের যে কৃচ্ছ্রসাধনের কথা লিখেছেন সে অভিজ্ঞতা অন্তত দিনেন্দ্রনাথের হয়নি। প্রপিতামহের এই পরম আদরের উত্তরাধিকারীর জন্যে টাট্টুঘোড়া থেকে যাবতীয় সুখ-আরামের ব্যবস্থা ছিল। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় তিনি স্নেহ কিঞ্চিৎ বেশি পেয়েছিলেন এবং উদ্দণ্ড-ও হয়ে উঠেছিলেন। গৃহপরিবেশেই তিনি সংগীত-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি সমূহ আগ্রহী হয়েছিলেন।

শিক্ষা : সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়বার সময় পিয়ানো বাদনে কৃতিত্বের দরুন তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। রাধিকা গোস্বামীর কাছে তিনি ধ্রুপদ সংগীতে তালিম নিয়েছিলেন। স্কুল থেকে একের পর এক তাঁর নামে অভিযোগ আসতে থাকায় তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে কিছুদিন বসিয়ে রাখা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে তৎকালে কোথাও দু-বছর শিক্ষকতার শংসাপত্র দেখাতে পারলে এন্ট্রান্সে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দেওয়া যেত। শিক্ষকতার মাধ্যমে এই যোগ্যতা অর্জনের জন্যে উনিশশো দুইতে তাঁকে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে

পাঠানো হয়। এইখানে তিনি অধ্যয়ন অপেক্ষা সংগীতচর্চা, নাট্যচর্চা, মজলিশি আড্ডায় অধিক কালাতিপাত করেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত থাকলে তিনি কখনও মাত্রাতিরিক্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন। এমনই এক অভিজ্ঞতার পরে তাঁর পিতা তাঁকে কলকাতায় এনে সিটি স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাসে ভর্তি করে দেন। দিনেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে উনিশশো তিনে এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। সেই বছরের শেষেই তিনি আবার শান্তিনিকেতনে পড়াতে চলে যান। তিনি পড়াতেন ইংরেজি ও বাংলা। মেধাবী দিনেন্দ্রনাথ নিজের চেষ্টায় ফরাসিও শেখেন। বিশ্বভারতী স্থাপিত হওয়ার পর প্রথম অতিথি অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি-র কাছেও তিনি ফরাসি শেখেন। হাতের লেখার মতোই দ্রুত তিনি স্বরলিপি লিখতে পারতেন। তাঁর সাহিত্যপাঠের পরিধিও ছিল অতি বিস্তৃত, সেটা তাঁর অনূদিত রচনা পড়লে বোঝা যায়। উনিশশো তিনেই তিনি শান্তিনিকেতনে সংগীত শিক্ষাদান করতে থাকেন।

উনিশশো চারে তিনি অভিভাবকদের অভিপ্রায়ে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ডে যান। সেখানে তিনি আইনবিশারদ হওয়ার চেয়ে পাশ্চাত্য সংগীতের রসোপভোগেই সবিশেষ আগ্রহী হন। উনিশশো পাঁচে প্রপিতামহের মৃত্যুর পর তিনি দেশে ফেরেন। কলকাতা থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকেন ও শান্তিনিকেতনে সংগীত শিক্ষাদান করতে থাকেন।

উনিশশো ছয়ে অসমাপ্ত ব্যারিস্টারি শেষ করবার জন্য তাঁকে আবার ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। দু বছর ব্যারিস্টারি অধ্যয়ন করে উনিশশো আটে পড়ায় ইস্তফা দিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

বিবাহ : আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই এই দুরন্ত মারকুটে তরুণের মেজাজ ঠান্ডা করতেই সম্ভবত, উনিশশো-র পাঁচ ফেব্রুয়ারি রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও সুনয়নী দেবীর কন্যা বীণাপাণির সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। বীণাপাণি তখনও সাবালিকা না হওয়ায় তাঁদের ফুলশয্যা হয় উনিশশো একের পঁচিশে এপ্রিল। শাশুড়ি সুনয়নী ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কনিষ্ঠা ভগিনী। দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ ছিলেন সহোদর ভ্রাতা। দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ; গিরীন্দ্রনাথের পৌত্রী সুনয়নীর পুত্রী ছিলেন বীণাপাণি। দ্বারকানাথের সাক্ষাৎ

বংশধরদের মধ্যে এ ধরনের বিবাহ হত যেহেতু তাঁরা পিরালি ব্রাহ্মণ হওয়ার দরুন সহজে কেউ এই বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতেন না। সুনয়নী দেবী ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর।

উনিশশো দুইয়ের পয়লা এপ্রিল বীণাপাণি ডিপথেরিয়া রোগে মারা যান। চার মাস পরে পনেরো অগাস্ট ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কমলার সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের পুনর্বিবাহ হয়। এই বিবাহের পরই তাঁকে এন্ট্রান্সে প্রাইভেটে বসার যোগ্যতা অর্জনের জন্যে শান্তিনিকেতনে পড়াতে পাঠানো হয়।

কর্মজীবন : উনিশশো দুইতে কয়েক মাস এবং উনিশশো আট থেকে উনিশশো চৌত্রিশ অবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি শান্তিনিকেতনে নিঃশুল্ক অধ্যাপনা করেন। তাঁর প্রপিতামহের সাধনাশ্রমের অন্যতম অছি এবং অর্থসচিব ছিলেন তাঁর পিতা দ্বিপেন্দ্রনাথ। দিনেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক উত্তরাধিকার সূত্রেই সেখানে অধ্যাপনা করতেন, সবেতন কর্মচারি হিসেবে নয়। এই কালের মধ্যেই তিনি বিশ্বভারতীর সংগীতভবন গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত সাতশো-র বেশি গানের স্বরলিপি রচনা তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। শান্তিনিকেতনে সংগীত ও অভিনয়কলার বিকাশে তাঁর অবদান রবীন্দ্রনাথের পরেই। তিনিই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কথায়, শান্তিনিকেতনের উৎসবপতি। অধ্যাপক হিসেবে তিনি ছিলেন সুভাষী-সুভদ্র, ছাত্রদরদি ও সকলের অত্যন্ত প্রিয়। কবি সুরকার হওয়া সত্ত্বেও তিনি আপন প্রতিভাকে প্রচ্ছন্ন রেখে রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি লেখনে, সংরক্ষণে, সম্প্রচারে ছিলেন সম্পূর্ণ আত্মনিবেদিত। কলকাতায় পেশাদার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়কালে তাঁর ডাক আসত সংগীতে তালিম দেওয়ার জন্যে। পরার্থে এমন আত্মোৎসর্গের তুলনা বিরল। রবীন্দ্রনাথের গানের সংরক্ষণে তাঁর ভূমিকা তুলনাহীন। উনিশশো বত্রিশের সতেরো ডিসেম্বর আয়োজিত দিনেন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করে আশীর্বাণীতে লিখলেন,

..."রবির সম্পদ হত নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।"

উনিশশো ষোলোর সাতাশে ফেব্রুয়ারি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ-রচিত গীতবহুল নাট্য 'ফাল্গুনী'। এর উৎসর্গ পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

"যাহাবা ফাল্গুনীর ফল্গু নদীটিকে বৃদ্ধ কবিব চিত্ত-মরুর
তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের
এবং সেই সঙ্গে
সেই বালকদলেব সকল নাটের কাণ্ডারী
আমার সকল গানের ভাণ্ডারী
শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথেব হস্তে
এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের 'একতারা'ব মতো
সমর্পণ করিলাম।"

এই উৎসর্গপত্র থেকেই দীনেন্দ্রনাথ হলেন দিনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমোচ্চারিত শব্দে বানানের সামান্য হেরফের ঘটিয়ে প্রপিতামহ-প্রদত্ত তাঁর নামের সম্পূর্ণ অর্থই পাল্টে দিলেন। রবি দিনকর, রবির উদয়ে দিনের উদয়, রবির আলোয় দিন আলোকিত, দিনের ইন্দ্র রবি—এই তাৎপর্য চরিতার্থ করতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নাতির নাম নিজের নামের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং নামটিকে বৈষ্ণব-পরম্পরা থেকে মুক্ত করলেন।

এই আনুষ্ঠানিক দ্বিজত্বপ্রাপ্তির আবেশে দিনেন্দ্রনাথ নিজের প্রতিভাকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রেখে কেবল রবীন্দ্রনাথের গানের, নাটকের এবং রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিভাবনের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তিনি পরে নিজেই স্বাক্ষর করতেন দিনেন্দ্রনাথ।

রচনা ও গ্রন্থ

দিনেন্দ্রনাথ-কর্তৃক প্রথম লিখিত রবীন্দ্রনাথের "(ও ভাই) বাঁচান বাঁচি মারেন মরি" স্বরলিপি প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ তেরোশো ষোলোর, উনিশশো নয়ের 'প্রবাসী' পত্রিকায়। তাঁর লেখা রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি সম্বলিত গ্রন্থ—

১. গীতলেখা ১, ১৩২৪, গান ২৯
২. গীতলেখা ২, ১৩২৫, গান ২৮
৩. গীত-পঞ্চাশিকা, ১৩২৫, গান ৫১
৪. বৈতালিক, ১৩২৫, গান ৩৬
৫. কেতকী, ১৩২৬, গান ৩৩
৬. শেফালি, ১৩২৬, গান ২৮
৭. কাব্যগীতি, ১৩২৬, গান ২৩
৮. গীতিবীথিকা, ১৩২৬, গান ২১
৯. গীতলেখা ৩, ১৩২৭, গান ২৪
১০. নবগীতিকা ১, ১৩২৯, গান ৩৪
১১. নবগীতিকা ২, ১৩২৯, গান ৫৯
১২. বসন্ত, ১৩৩০, গান ২৪
১৩. গীতমালিকা ১, ১৩৩৩, গান ৪০
১৪. গীতমালিকা ২, ১৩৩৬, গান ৫০

১৫. তপতী, ১৩৩৬, গান ১০
১৬. চণ্ডালিকা, ১৩৪০, তাঁর স্বরলিপি ৭
১৭ স্বরবিতান ১, ১৩৪২, গান ৫০
১৮. স্বরবিতান ২, ১৩৪৩, গান ৫০
১৯. স্বরবিতান ৩, ১৩৪৫, গান ৫০
২০. স্বরবিতান ৫, ১৩৪৯, গান ৫০
২১. বাল্মীকি-প্রতিভার স্বরলিপি, ১৩৩৫

এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। 'গীতমালিকা ১'-এর তেরোশো পঁয়তাল্লিশের সংস্করণে সংযোজিত হয় আরও দশখানি স্বরলিপি। উনিশশো আঠারোতে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত রবীন্দ্রনাথের গানের আটটি স্বরলিপি 'গীতপত্র' নামে প্রকাশিত হয়।

জীবিতকালে তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'বীণ' প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরই উদ্যোগে 'বোলপুর/ব্রহ্মচর্যাশ্রম' ঠিকানা থেকে। এই গ্রন্থে প্রকাশের সন উল্লেখ করা হয়নি এবং এ বিষয়ে কোনও বাড়তি তথ্য মেলে না। অনুমান করা হয়ে থাকে যে, উনিশশো বারো নাগাদ এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলিকে কাব্যগ্রন্থের সম্পুটে সঞ্চয় করে রাখাই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁব প্রথম পত্নী বীণাপাণির বিরহের আতুরতা থেকেই এই গ্রন্থের বহু কবিতা উদ্‌গত হয়েছিল। অজ্ঞাত কারণে এই গ্রন্থের যত কপি তাঁর কাছে ছিল সেগুলি তিনি অগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়ে তুর্গেনেফের গল্প অনুবাদ করিয়েছিলেন যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়েছিল। 'সুফি ধর্ম', 'রবীন্দ্র-সংগীত', 'সংগীত-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' প্রবন্ধে তাঁর মৌলিক ভাবনার পরিচয় মেলে। উল্লেখযোগ্য যে, 'রবীন্দ্রসংগীত' অভিধাটি তিনিই তৈরি করে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী কমলা দেবী তেরোশো তেতাল্লিশে, চার বকুলবাগান রো, ভবানীপুর, কলকাতা থেকে তাঁর রচনাবলী 'দিনেন্দ্র-রচনাবলী' নামে প্রকাশ করেন। এঁর প্রচ্ছদে হরিণের ছবি এঁকেছিলেন দিনেন্দ্রনাথের সুহৃদ নন্দলাল বসু। নিঃসন্তান দিনেন্দ্রনাথ ও কমলা অপত্য-স্নেহে হরিণ ও কুকুর পুষতেন। সেই হরিণ পথভ্রষ্ট হয়ে দূরে সাঁওতাল পল্লিতে চলে গেলে পল্লিবাসীরা সেটিকে হত্যা করে। দিনেন্দ্রনাথ ও কমলার দুঃখে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন "সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে" গানটি। এটি বৈশাখ তেরোশো পঁচিশ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হয়।

শেষ জীবন ও মৃত্যু : দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারীরা ওড়িশার জমিদারি পেয়েছিলেন। বাকি জমিদারি সপুত্রক সন্তান

দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এজমালি থাকে। উনিশশো তেইশে বিষয়-সম্বন্ধে উদাসীন দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতার এবং সম্পত্তির জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অপর দু-ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অনুকূলে 'ভুবাসন পত্র' বা ডিড অফ সেটলমেন্ট স্বাক্ষর করলেন। জমিদারি পাকাপাকিভাবে ভাগ করে নিলেন সত্যেন্দ্রনাথের তরফে তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ হলেন কালিগ্রাম-পতিসরের এবং সুরেন্দ্রনাথ হলেন বিরাহিমপুর-শিলাইদহের জমিদার। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই প্রমথ চৌধুরির দৌত্যে এই ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হলেও দ্বিপেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর তা আইনি হল। রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের জমিদারিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্র-পৌত্রদের অংশ অনির্ণীত রইল। রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ এই অনির্ণীত জমিদারির স্বত্বভোগের দরুন দ্বিজেন্দ্রনাথদের মাসোহারা দেওয়ার কড়ার করলেন।

সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'সুরপুরী' নামে একটি বাসস্থান নির্মাণ করলেও সেখানে বসবাস করেননি। দিনেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসনে তাঁর অংশ ও দাবি পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে লিখে দেন এবং দশহাজার টাকায় 'সুরপুরী' কেনেন। স্থির হয় যে 'সুরপুরী' ক্রয় বাবদ দশ হাজার টাকা বাদে যে চল্লিশ হাজার টাকা দিনেন্দ্রনাথের পাওনা থাকবে তা রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ মাসিক কিস্তিতে দেবেন।

রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ কথা রাখতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁর সন্তানেরা সম্পূর্ণ জমিদারির আয়ের উপর নির্ভর করে থাকায় তাঁরা বছরের পর বছর বিড়ম্বনা ভোগ করতে থাকেন। মাসোহারার খেলাপে দিনেন্দ্রনাথের গরমে দার্জিলিং-এ যাওয়া হয়নি। এমনকি দিনেন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় শান্তিনিকেতন সংগীতভবনের জন্যে বাজেট বরাদ্দও বন্ধ হল।

এই অবস্থায় উনিশশো চৌত্রিশের মার্চে দিনেন্দ্রনাথ নীরবে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে আসেন। পাঁচ পুরুষে দ্বারকানাথের নামের প্রথম অক্ষর দ-দিয়ে নামকরণের শেষ উত্তরাধিকারী এবং তাঁর প্রজন্মের জ্যেষ্ঠ সন্তান দিনেন্দ্রনাথ আগেই পৈতৃক ভদ্রাসনের দাবি খুইয়েছিলেন। ফলে পিতৃ-পিতামহের জন্মভিটেয়, রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা' গৃহের দ্বিতলে তিনি রবীন্দ্রনাথের বকলমে রথীন্দ্রনাথের ভাড়াটে হিসেবে এসে রইলেন্। ছয় এপ্রিল কলকাতার নাট্য-নিকেতন মঞ্চে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির টেগোর ড্রামাটিক ক্লাবের তরফে

বিহারের ভূকম্প পীড়িতদের সাহায্যার্থে 'রক্তকরবী' অভিনীত হল প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় ও দিনেন্দ্রনাথের সংগীত পরিচালনায়। এই অভিনয় দেখতে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। সাতাশে ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে প্রথম অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স হয় দিনেন্দ্রনাথ ও প্রণবেশচন্দ্র সিংহের যুগ্ম-সচিবত্বে। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশশো চৌত্রিশ থেকে যে ক-মাস দিনেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের ভাড়াটে ছিলেন সে কয় মাস পৌত্র দিনেন্দ্রনাথের রক্তচক্ষু এড়াতে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে অতিথি হতেন বরানগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'আম্রপালি' গৃহে।

শান্তিনিকেতনে ছাত্র ও ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে আমোদিয়া দিনেন্দ্রনাথ উৎসবপতি হিসেবে বিরাজ করতেন। জোড়াসাঁকোয় এসে তিনি হলেন নিঃসঙ্গ, একলা।

বিশাল ঠাকুর পরিবারের কোনও সদস্যই রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় বা বিশ্বভারতী প্রকল্পে সক্রিয় সাহায্য করেননি। শিক্ষকতাও করেননি। একমাত্র দিনেন্দ্রনাথই ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি চলে আসার পর বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে বেতনভুক অধ্যাপনার প্রস্তাব এলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

উনিশশো পঁয়ত্রিশের একুশে জুলাই মধ্যরাতে দিনেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস রোগে তেপ্পান্ন বছর বয়সে প্রয়াত হন। দিনেন্দ্র-রচনাবলীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'চিরজীবন অন্যকেই সে প্রকাশ করেছে, নিজেকে করেনি। তার চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হত। কেন না, নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিস্মরণশক্তি অসাধারণ। আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য, এমনকি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখিনি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল। আজ স্পষ্টই অনুভব করছি, তার স্বকীয় রচনা-চর্চার বাধাই ছিলেম আমি। কিন্তু তাতে তার আনন্দ যে ক্ষুণ্ণ হয়নি, সে কথা তার অক্লান্ত অধ্যবসায় থেকেই বোঝা যায়।'

দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'আজি বারিষণ মুখরিত শ্রাবণরাতি', 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ', 'জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে', 'আমার কী বেদনা সে কি তুমি জান' গানগুলি।